জুন ২০১৬, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের নোট শনাক্ত ও চিহ্নিতকরণ

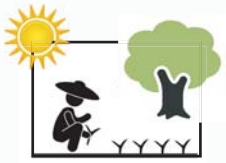

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ

আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

খুলনায় পেশাজীবীদের মধ্যে প্রথম যে স্বাধিকার আন্দোলন হয় তার নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

মুহাম্মাদ নাফিউদ্‌দীন
প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক

evsjv‡`k e¨vsK, Ljbv Awd‡mi Aemicÿ Dcgnve¨e¯vcK gnv¤§v` bwdD``xb| 1962 mv‡ji 19 Gwcj evsjv‡`k e¨vs‡Ki PvKwi‡Z †hvM`vb K‡ib| 1999 mv‡ji 28 †deªæqvwi Dcgnve¨e¯vcK wn‡m‡e Aem‡i hvb| ¯§wZgq w`‡bi Gev‡ii Av‡qvR‡b cwiµgvi Ljbv cwZwbwa Gb. G. Gg mvi I qv‡i AvLZvi Rvnv‡bi mv‡_ wZwb wewfb AwfÁZv, civgk I ¯§wZK_v wewbgq K‡ib|

cvq 17 eQi Avcwb Aem‡i i‡q‡Qb| Avcbvi †d‡j Avmv w`b¸‡jv m¤ú‡K Rvb‡Z PvB-

মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। ১৯৬২ সালের ১৯ এপ্রিল আমি তদানীন্তন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের খুলনা শাখায় যোগদান করি। এটাই আমার প্রথম চাকরি। মনে পড়ে, ব্রজেন্দ্র লাল চৌধুরী নামের সিনিয়র কর্মকর্তা আমাকে এমনভাবে কাজ সম্পর্কে ধারণা দেন, যেন তিনি আমার পিতা আর আমি তাঁর পুত্র। সেসময় ডেপুটি গভর্নরের একটা অফিস তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ছিল কিন্তু আঞ্চলিক ডাইরেক্টরেট করাচিতে হওয়ায় আমাদের প্রতি উর্ধ্বতনদের একটি বৈষম্যের মনোভাব ছিল। তবে আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যারা বাঙালি ছিলেন তাঁরা আমাদের সহযোগিতা করতেন।

'শেষ পর্যন্ত আমার বাংলা স্বাক্ষরকে তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়'- মুহাম্মাদ নাফিউদ্‌দীন

PvKwiRxe‡b †Kv_vq †Kv_vq KvR K‡i‡Qb ?

আমার প্রথম পোস্টিং বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টে। এছাড়া প্রশাসন, ব্যাংকিং, ডেডস্টকে কাজ করেছি। এছাড়া ঢাকা অফিসের সরকারি হিসাব বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ ছাড়াও বগুড়া অফিসে দায়িত্ব পালন করি।

PvKwiRxe‡bi Ggb †Kv‡bv ¯§wZ Av‡Q hv GL‡bv Avcbv‡K Av‡eMZwoZ K‡i ?

মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনা। জুন মাসের দিকে পাকিস্তানিরা গভীর রাতে রেমিট্যান্স নিয়ে নৌ ঘাঁটিতে আসে। ওরা শ্রমিকদের খুব গালিগালাজ করে এবং রেমিট্যান্স বুঝে নিতেও আমাদের সময় দেয়নি। এছাড়া ১৯৭১ এর ১৭ ডিসেম্বর পাক সেনারা আমাদের ভল্টের সব নোট পুড়িয়ে দেয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘেরাও করে। আরেকটি ঘটনা বলি, স্বাধীনতার আগে অ্যাসোসিয়েশনের কাজে একবার করাচি গিয়েছি। আমি বাংলায় স্বাক্ষর করি বলে ওদের হোটেল কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বাংলা স্বাক্ষরকে তারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। খুলনায় পেশাজীবীদের মধ্যে প্রথম যে স্বাধিকার আন্দোলন হয় তার নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

wb‡Ri †Kvb KvR‡K †miv KvR wn‡m‡e g‡b K‡ib-

ঢাকা অফিসের যুগ্মব্যবস্থাপক পদে কর্মরত অবস্থায় ক্যান্টিনের তৈজসপত্রগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছিলাম। খুব ছোট কাজ হলেও প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরে বিষয়টি। ভাবলে ভালো লাগে।

KgRxeb Qvov Avcbvi Ab¨ cwiPq¸‡jv m¤ú‡K wKQ ej‡eb wK ?

আমি খুলনা সাহিত্য পরিষদের প্রথম দিকের সদস্য। পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময় দেশ সেরা সাহিত্যিকদের আনা হতো। সেই সুবাদে পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, ড. মনিরুজ্জামান, ড. আনিসুজ্জামান, ড. মনিরুজ্জামান মিয়া, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ অনেকের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এছাড়া আমি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় সমিতি, খুলনার প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। এই সমবায় আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় রাশিয়া সরকারের বৃত্তি এবং বাংলাদেশ সরকারের মনোনয়নে আমি ১৯৭৬ সালে এক বছরের জন্য মস্কো গিয়ে সমবায় ও গ্রামীণ উন্নয়নের উপরে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।

eZgvb mg‡qi evsjv‡`k e¨vsK m¤ú‡K wKQ ejb|

আমাদের সময় তো সব কাজ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতো, তাই সময় লাগত বেশি। এখন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সংক্ষেপে আপনারা অনেক বেশি কাজ করতে পারেন।

e¨w³MZ Rxe‡b Avcwb †Kgb Av‡Qb ?

আমার দুটো ছেলে একটা মেয়ে। মেয়ে স্বামীসহ সিঙ্গাপুর প্রবাসী। ছেলেমেয়েরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী।

bZb‡`i D‡Ï‡k¨ wKQ ejb|

নতুনদের খুব ক্যারিয়ার সচেতন হয়ে নতুন কিছু করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের আমি তিনটি উপদেশ দিতে চাই- দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখতে হবে এবং মানবিক হতে হবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

■ **সম্পাদক**
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ **বিভাগীয় সম্পাদক**
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
মহুয়া মহসীন
নুরুন্নাহার
আজিজা বেগম

■ **গ্রাফিক্স**
ইসাবা ফারহীন
তারিক আজিজ

■ **আলোকচিত্র**
মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের নোট শনাক্ত ও চিহ্নিতকরণ শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) ও ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব কারেন্সি টেকনোলজি (আইআইসিটি) এর যৌথ উদ্যোগে ১৪ মে ২০১৬ 'ব্যাংক নোট শনাক্তকরণ ও জাল নোট চিহ্নিতকরণে অন্ধদের সচেতনতা' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা, বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী, এবিবির চেয়ারম্যান আনিস এ. খান, বিভিআইপিএসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনছুর আহমেদ চৌধুরী এবং বর্তমান সভাপতি সাইদুল হক, ফ্রান্সের জালনোট বিশেষজ্ঞ জো ক্যাসিডি, আইআইসিটির চেয়ারম্যান ড. জালাল উদ্দিন, ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ শারমিন ও আইআইসিটি'র মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এবিএম তায়েফুল ইসলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নোট শনাক্ত ও চিহ্নিতকরণ শীর্ষক সেমিনারে গভর্নর ফজলে কবির এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের একাংশ

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে দেশে প্রচলিত সব কাগজি নোটে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সংযোজনের ঘোষণা দেন। তিনি আরো বলেন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের চেনার সুবিধার পাশাপাশি নোটের নিরাপত্তা বিধানে দেশে প্রচলিত ১০ থেকে ১ হাজার টাকার কাগজি নোটে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে ১০ টাকার নোটের ডানপাশে বিশেষ নিরাপত্তামূলক কালিতে ছাপানো একটি বর্গ রয়েছে, যা হাতের স্পর্শে সহজেই অসমতল বলে অনুভূত হয়। একইভাবে ২০ টাকার নোটের ডান পাশে একটি বিন্দু, ৫০ টাকার নোটে দুটি বিন্দু, ১০০ টাকার নোটে তিনটি বিন্দু, ৫০০ টাকার নোটে চারটি বিন্দু এবং ১ হাজার টাকার নোটে পাঁচটি বিন্দু রয়েছে। এসব বিন্দু হাতের স্পর্শে সহজেই অসমতল অনুভূত হয়। এরপরও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দৃষ্টিহীনদের সুবিধায় নোট শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় আরো পরিবর্তন আনা হবে।

গভর্নর বলেন, দৃষ্টিহীনরা নয়; বরং শিক্ষা ও প্রজ্ঞাহীন মানুষই প্রকৃত অন্ধ। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা অন্যদের মতো দেখতে না পেলেও তাদের একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। আমাদের দায়িত্ব হবে তাদের জন্য এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে তারা সমাজে স্বাভাবিকভাবে বিচরণ করতে পারে। অর্থের মূল্যমান বুঝতে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংককে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

গভর্নর ফজলে কবির বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাংকের ২০১১ সালের একটি যৌথ জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, অনুন্নত দেশগুলোয় সব ধরনের প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেশে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১ দশমিক ৪ শতাংশ বা ২০ লাখের কাছাকাছি। এ বিপুল সংখ্যক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীর এক বড় অংশ গ্রামে বাস করে, যারা অনেক ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে এ জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করতে হবে।

সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা বলেন, কিছু দিনের মধ্যে ১০০ ও ৫০০ টাকার নতুন নোট বাজারে আসবে। এ নোটগুলোতে অনেক বেশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। যা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য অনেক বেশি সহায়ক হবে। আর সবার প্রচেষ্টায় জাল নোটমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে অন্য বক্তারা বলেন, বিশ্বের অন্যান্য সব দেশের মতো বাংলাদেশেও জালনোট একটি বড় সমস্যা। যা দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর এবং সাধারণ জনগণের জন্য ভোগান্তির কারণ। আর অন্ধদের ক্ষেত্রে জালনোট চেনা আরও কঠিন। জালনোট চিহ্নিতকরণে অন্ধদের জন্য এ ধরনের সচেতনতামূলক সেমিনার সারাদেশে আয়োজন আজ সময়ের দাবি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুই শতাধিক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীর হাতে বাজারে প্রচলিত আটটি বিভিন্ন মূল্যমানের কাগজি নোট দিয়ে তা শনাক্তকরণে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকা আয়োজিত আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান- ২০১৬, ৫ মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। জমকালো এই অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃঅফিস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২০১৬ তে অংশগ্রহণকারী ২৫টি টিমের কোচ ও ম্যানেজারদের নিয়ে ২৭ এপ্রিল ২০১৬ ব্যাংক ক্লাবে ড্র অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন টিম ডিএমডি ও রানার্সআপ টিম ডিবিআই-৪ অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ আহমেদ আলী, মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান সর্দার, প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক। এছাড়াও সিবিএ, ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, ব্যাংক ক্লাবের সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ব্যাংক ক্লাবের সাবেক সভাপতি নওশাদ মোস্তাফা ও হামিদুল আলম সখা, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সভাপতি আবু হেনা হুমায়ুন কবির লনী এবং ব্যাংক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলাম আরিফ।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন

মুদ্রানীতি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিটের উদ্যোগে ৮ মে ২০১৬ 'Monetary policy and critical issues for Bangladesh Bank' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর ফজলে কবির উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী উপস্থিত ছিলেন। আরো উপস্থিত ছিলেন চিফ ইকোনোমিস্ট ড. বিরূপাক্ষ পাল, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, সিনিয়র ইকোনোমিক অ্যাডভাইজার ফয়সাল আহমেদসহ নির্বাহী পরিচালকগণ, আমন্ত্রিত গবেষক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রধান অতিথি গভর্নর ফজলে কবির বলেন, মুদ্রানীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে এমন আয়োজন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেমিনার থেকে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঠিক মুদ্রানীতি প্রণয়নে সহায়তা করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। আয়োজনের সাফল্য কামনা করে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী এ উদ্যোগের জন্য আয়োজক চিফ ইকোনোমিস্টস্ ইউনিটকে ধন্যবাদ জানান গভর্নর।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মালয়েশিয়ার উতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিআইএমবির অধ্যাপক ড. সেলিম রশীদ। বাস্তবসম্মত মুদ্রানীতি প্রণয়নের নানা দিক নিয়ে তিনি নির্দেশনামূলক তথ্য উপস্থাপন করেন। এছাড়াও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কোনো দেশের মুদ্রানীতি কিভাবে প্রণয়ন হয় তাও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে। একইসাথে মুদ্রানীতি সংশ্লিষ্ট গৃহীত সিদ্ধান্তের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক এবং যৌক্তিক, অযৌক্তিকতার বিষয়ে আলোকপাত করেন তিনি। ড. সেলিম রশীদ এশিয়া-আফ্রিকা মহাদেশসহ রাষ্ট্রভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রণয়ন বিষয়েও বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এসময় বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মুদ্রানীতি বিষয়ে নিজের পর্যালোচনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন ড. সেলিম রশীদ।

গভর্নর মুদ্রানীতি বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর উপস্থাপিত বিষয়ের উপর আমন্ত্রিত অতিথি, গবেষক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। আলোচনায় উঠে আসা নানা প্রশ্ন এবং মতামতের উপর ব্যাখা দেন অধ্যাপক ড. সেলিম রশীদ।

নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় এশিয়া ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অন বাজেট অ্যান্ড পলিসির যৌথ উদ্যোগে জেলা পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ৮ মে ২০১৬ 'Facilitate district women entrepreneurs access to finance in Bangladesh' শীর্ষক এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায় এবং এশিয়া ফাউন্ডেশনের ডেপুটি কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ সারা এল টেইলর। আলোচক হিসেবে ছিলেন আইটি বিশেষজ্ঞ ও দৈনিক প্রথম আলোর যুব সংগঠক মুনির হাসান। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত উইমেন চেম্বারের সদস্যবৃন্দ ও নারী উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণ পাওয়া নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয়, এটি যেমন সত্য; ঠিক তেমনি আমরা পূর্বের তুলনায় ঋণ ব্যবস্থাপনাকে আরো সহজতর করেছি সেটাও সত্য। নারী উদ্যোক্তারা বিভিন্ন সময় হয়রানির শিকার হন, সে বিষয়ে তথ্য যাচাই করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন তিনি। একইসাথে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে সম্যক ধারণা দিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার বিষয়েও পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে সবসময় বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথি এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায় বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক সব ধরনের সহযোগিতার জন্য নারী উদ্যোক্তাদের পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ সারা এল টেইলর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে এমন উদ্যোগে সামিল হতে পেরে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

আইটি বিশেষজ্ঞ মুনির হাসান তাঁর বক্তব্যে নারী উদ্যোক্তারা যেন আইটিসহ নতুন নতুন ব্যবসায়িক মডেল নিয়ে কাজ করতে পারে সে বিষয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নারী উদ্যোক্তা ইউনিটের পক্ষ থেকে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তি এবং ব্যবসা সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন উপমহাব্যবস্থাপক ওয়াহিদা নাসরিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের চেয়ারম্যান এবং সেন্টার অন বাজেট অ্যান্ড পলিসির প্রধান ড. এম. আবু ইউসুফের সঞ্চালনায় বিভিন্ন জেলা থেকে আগত উইমেন চেম্বারের কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ তাদের সমস্যা এবং দাবি তুলে ধরেন।

ব্যাংকিং সেক্টরের নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ১৮ মে ২০১৬ 'Security Challenges in Banking Sector of Bangladesh' শীর্ষক এক এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। বিশেষ অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান এবং এস. কে. সুর চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল অ্যাডভাইজার গ্লেন টাস্কি, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান, সিনিয়র ইকোনোমিক অ্যাডভাইজার ফয়সাল আহমেদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোহাম্মদ আমিনুল হাসান, এনডিসি, পিএসসি।

গভর্নর ব্যাংকিং সেক্টরের নিরাপত্তা বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির শুরুতেই ব্যাংকিং সেক্টরের সাইবার নিরাপত্তার মতো চলমান ইস্যু নিয়ে সেমিনার আয়োজন করায় বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান। গভর্নর কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এমন প্রয়োজনীয় এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর প্রতি মাসে একটি করে সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে নির্দেশনা দেন। এক্ষেত্রে এক মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তাদের এবং পরের মাসে বাইরের দক্ষ গবেষকদের আমন্ত্রণ করে সেমিনার আয়োজনের পরামর্শ দেন তিনি। এটি হলে ইনহাউজ কর্মকর্তাদের জ্ঞান বাড়ার পাশাপাশি উপস্থাপন দক্ষতাও বাড়বে। সেমিনার থেকে লব্ধজ্ঞান আইটি নিরাপত্তা ইস্যু এবং সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে কর্মকর্তাদের সহায়তা করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন গভর্নর। আয়োজনের সাফল্য কামনা করে এ সময় সেমিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গভর্নর ফজলে কবির।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, ব্যাংকের প্রতি মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে নিরাপত্তায় কোনো ছাড় দেয়ার সুযোগ নেই। দেশের ব্যাংকের রক্ষক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যেক কর্মকর্তাকে নিরাপত্তা রক্ষায় সদা তৎপর থাকতে হবে। এজন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানসহ তথ্যগত বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখার পাশাপাশি সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান ডেপুটি গভর্নর।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোহাম্মদ আমিনুল হাসান বলেন, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের অবশ্যই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায়ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নাহলে আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হব। প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানেও আমাদের দক্ষ হতে হবে। এমনকি কোনো প্রযুক্তিগত ব্যাপার যেমন সাইবার থ্রেট, হ্যাকিং বা ম্যালওয়্যারের মাধ্যমে ভাইরাস বা তথ্য চুরি ঠেকাতে আইটি বিষয়ক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান বাড়ানোর দাবি জানান তিনি। সেমিনারে স্বাগত ভাষণ দেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। এসময় নানা প্রশ্ন এবং মতামতের উপর ব্যাখা দেন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোহাম্মদ আমিনুল হাসান। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির মহাব্যবস্থাপক এ কে এম ফজলুর রহমানের ধন্যবাদ ভাষণের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

একক গ্রাহকের অতিরিক্ত ঋণ সমন্বয়ের নির্দেশ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারের ভুল ব্যাখ্যা করে একক গ্রাহককে আইন নির্ধারিত মূলধনের ২৫ শতাংশের বেশি ঋণ দিয়েছে কয়েকটি ব্যাংক। বাড়তি এ ঋণ আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্ধারিত সীমায় নামিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ১১ মে ২০১৬ তারিখে এ বিষয়ে সার্কুলার জারি করে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের কাছে এ নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। সার্কুলারে ব্যাংক কোম্পানি আইনের এ সংক্রান্ত ধারা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, কোনো ব্যাংক একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপকে মূলধনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ ঋণ দিতে পারে। তবে আইনে ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড বিষয়ে কিছু উল্লেখ ছিল না। এ কারণে ২০১৪ সালে এক নির্দেশনার মাধ্যমে একক গ্রাহককে ফান্ডেড সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ ঋণ প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়। ওই সার্কুলারে বিশেষ কয়েকটি খাত বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড দায়েরের বিষয়টি ছাড় দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে একক গ্রাহককে যেখানে ফান্ডেড সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশসহ মোট ২৫ শতাংশ ঋণ দেওয়া যাবে, ছাড় দেওয়া খাতে ফান্ডেড ঋণই হতে পারবে ২৫ শতাংশ। তবে অনেক ব্যাংক এ নির্দেশনার ভুল ব্যাখ্যা করে একক গ্রাহককে ২৫ শতাংশের বেশি ঋণ দিয়েছে। এখন বাড়তি এ ঋণ সমন্বয়ের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। উল্লেখ্য, ছাড় দেওয়া খাত বা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ৫০ শতাংশের বেশি শেয়ার রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান, সরকার বা আন্তর্জাতিক বহুজাতিক ব্যাংকের গ্যারান্টি থাকা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ খাতের প্রতিষ্ঠান ও কলমানি মার্কেট থেকে নেওয়া ধার। এসব ক্ষেত্রে একক গ্রাহকের সর্বোচ্চ সীমার পুরোটাই ফান্ডেড হতে পারবে।

৩৮ ব্যাংককে সম্মাননাপত্র প্রদান

২০১৪-১৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কৃষিঋণ বিতরণ করায় ৩৮টি ব্যাংককে সম্মাননাপত্র দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ওই অর্থবছরে এসব ব্যাংক ১৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিতরণ করেছে ১৫ হাজার ৯৭৯ কোটি টাকার ঋণ।

১১ মে ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সফল ৩৮টি ব্যাংককে গভর্নর ফজলে কবির স্বাক্ষরিত সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়। ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহী ও প্রতিনিধিদের হাতে সম্মাননাপত্র তুলে দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী।

সম্মাননা পাওয়া ব্যাংকগুলো হলো জনতা, কৃষি, বেসিক, ইসলামী, আল-আরাফাহ্ ইসলামী, সোস্যাল ইসলামী (এসআইবিএল), এক্সিম, পূবালী, উত্তরা, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স, ইউসিবি, ব্যাংক এশিয়া, আইএফআইসি, প্রিমিয়ার, এনআরবি কমার্শিয়াল, বাংলাদেশ কমার্স, ব্র্যাক ব্যাংক, প্রাইম, যমুনা, স্ট্যান্ডার্ড, ওয়ান, মিউচুয়াল ট্রাস্ট, মধুমতি, মিডল্যান্ড, ট্রাস্ট, ইবিএল, ডাচ্-বাংলা, দি সিটি, এনআরবি, দি ফারমার্স, উরি, হাবিব, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, আল-ফালাহ, সিটি এনএ, এইচএসবিসি, কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড। নিয়মানুযায়ী, কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারলে যে অর্থ থেকে যায় তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা বাধ্যতামূলক। এ অর্থের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো সুদ দেয় না। পরের বছর অনার্জিত অংশসহ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা থাকা অর্থ ফেরত দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, আলোচ্য অর্থবছরে ১৮টি ব্যাংক কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি।

সিলেট অফিস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল, সিলেটের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩০ মার্চ ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেটের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কবিতা কুন্ডু। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে মননশীল মেধা বিকাশ ও সৃজনশীল জাতি গঠনে শিক্ষার্থীদের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে সহশিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা একটি জাতিকে বিশেষভাবে পরিচিত করে। তাই স্কুলের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখতে শিক্ষার্থীদের তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ রুহুল আমিন। অভিভাবকদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান এবং সিবিএ'র পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মোঃ মোফাখ্খারুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাসহ শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) কর্তৃক আয়োজিত 'Financial Analysis for Bankers' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটি ১৭-২১ এপ্রিল ২০১৬ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। বিআইবিএমের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সোহেল মোস্তফা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী দিনে বিআইবিএমের অধ্যাপক ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. শাহ মোঃ আহসান হাবীব 'Malpractices in Trade Service of Banks in Bangladesh' শীর্ষক বিশেষ বক্তব্য প্রদান করেন। সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। অনুষ্ঠানে সিলেট অঞ্চলের ৫০টি ব্যাংকের বিভাগীয় ও আঞ্চলিক প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৭২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন

ময়মনসিংহ অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিসে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন শীর্ষক মতবিনিময় সভা ২১ এপ্রিল ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ময়মনসিংহ অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হাকিম। বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিসের কৃষি ঋণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুল আলী উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া সভার প্রথম পর্বে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক এবং দ্বিতীয় পর্বে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের বিভাগ/অঞ্চল ও শাখা প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন।

মুখ্য আলোচকের বক্তব্যের পর উপস্থিত প্রতিনিধিরা আগামী অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন সুপারিশ উপস্থাপন করেন। প্রধান অতিথি উপস্থিত ব্যাংক প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও তিনি আগামী অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালায় সভায় উপস্থাপিত সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। কৃষিবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামগ্রিকভাবে কাজ করা ও আলোচ্য অর্থবছরে শতভাগ কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের জোর প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য প্রধান অতিথি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মতবিনিময় সভায় মহাব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখছেন

বরিশাল অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসে '২০১৫-১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন কৌশল এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন' শীর্ষক মতবিনিময় সভা ৭ এপ্রিল ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বরিশাল অফিসের কৃষি ঋণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বরিশাল অফিসের আওতাধীন জেলাসমূহে অবস্থিত সকল তফসিলি ব্যাংকের স্থানীয় প্রধান কর্মকর্তাগণ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুল হাকিম মুখ্য আলোচক ছিলেন এবং উক্ত বিভাগের উপপরিচালক মোঃ রেজাউল করিম অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দিনব্যাপী এ মতবিনিময় সভাটি দুটি সেশনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সেশনে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিগণ এবং দ্বিতীয় সেশনে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় মহাব্যবস্থাপক ও মুখ্য আলোচক কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার, বাংলাদেশ ব্যাংক

মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী বক্তব্য রাখছেন

প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাদি, ব্যাংকসমূহের কৃষিঋণ বিতরণ পরিস্থিতি, বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ ব্যাংকসমূহের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিগণ এ অঞ্চলে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং তা কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালায় সংযোজনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভায় বার্ষিক কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা অনুসারে প্রকৃত কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণে কৃষি ঋণের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান জানানো হয়। সেশন দুটি পরিচালনা করেন যুগ্মপরিচালক অসিত ভূষণ শীল।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা - মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা -১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ bank.parikroma@bb.org.bd

সদরঘাট অফিস

বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট অফিসে সম্প্রতি বর্ষবরণ-১৪২৩ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আল্পনা অংকন, পান্তা উৎসব ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ উদ্‌যাপিত হয়।

বর্ষবরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়

মহাব্যবস্থাপক মোঃ ইউনুস আলী উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ ইউনুস আলীর সহধর্মিনী জান্নাতুল তহুরা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক আহম্মদ আলীসহ অন্য অতিথিবৃন্দ। প্রধান অতিথি এ আয়োজনে অংশ নিতে পেরে আনন্দিত বলে জানান এবং সেসাথে আয়োজক, শিল্পীসহ অনুষ্ঠানে আগত সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। বর্ষবরণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সদরঘাট অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের স্বজনরা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র, নজরুল, জারি, সারি, মুর্শিদী, পল্লি, বাউল গানসহ নাচ এবং কবিতা পরিবেশন করা হয়। উপব্যবস্থাপক সাইরুল ইসলাম এ অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন।

খুলনা অফিস

পুনঃঅর্থায়ন তহবিল বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় এমএফআই-লিংকেজে ১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য ২০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল পরিচালনার লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজনের অংশ হিসেবে ২১ এপ্রিল ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে দিনব্যাপী একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে এবং খুলনা অফিসের ব্যবস্থাপনায় এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় বিভিন্ন ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

উক্ত অনুষ্ঠানে খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক প্রধান অতিথি ও মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক নুরুন নাহার। এছাড়া, বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির ডিরেক্টর মোঃ সাজ্জাদ হোসেন।

১০ টাকার হিসাবধারীদের জন্য এমএফআই লিংকেজে ঋণ বিতরণকে তিনি একটি কার্যকরী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বলে মত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ব্যাংকের কাজকে সহজীকরণ ও প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এমএফআইগুলো কাজ করছে।

খুলনা অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ

প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এবং সহজে শস্য ও ফসল ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে সাতক্ষীরা জেলা কৃষি ঋণ কমিটির উদ্যোগে ২৫ এপ্রিল ২০১৬ কৃষিঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাতক্ষীরার কুমিরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জনতা ব্যাংক লিঃ, এরিয়া অফিস এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসেবে জনতা ব্যাংক লিঃ খুলনার মহাব্যবস্থাপক মোঃ কবির আহম্মদ ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, খুলনার মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল্লাহ ছাব্বির এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার কৃষিঋণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক বেগম হালিমা, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, সাতক্ষীরা প্রিন্সিপাল অফিসের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল কাদের ও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, সাতক্ষীরা আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ আশরাফ উল আলম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনতা ব্যাংক লিঃ, সাতক্ষীরা এরিয়া অফিসের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ সোলায়মান হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক

এসময় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও ঋণ গ্রহণেচ্ছু বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র বর্গাচাষি ছাড়াও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে ৬৭ জন প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষির মাঝে প্রায় ২৩ লাখ ৬৪ হাজার টাকার কৃষি ও পল্লি ঋণ সরাসরি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তা, ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও যথাসময়ে ঋণ পরিশোধের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন।

ব্যাংকার- উদ্যোক্তা সমাবেশ

সাতক্ষীরা অঞ্চলে উৎপাদন ও বিবিধ ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের সহযোগিতায় ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সমাবেশ ১৯ এপ্রিল ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে সাতক্ষীরা শহরের একটি পর্যটন স্পটে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশের আয়োজনের দায়িত্ব পালন করে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড, সাতক্ষীরা শাখা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনার এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী এবং ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের হেড অব এসএমই (এসভিপি) সাহাদাত আহমেদ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওয়ান ব্যাংক লিমিটেডের যশোর শাখার ব্যবস্থাপক (এসএভিপি) আবু সাঈদ মোঃ মান্নাফ। স্থানীয় সমন্বয়কারী হিসেবে ব্যাংকটির সাতক্ষীরা শাখার ব্যবস্থাপক (প্রিন্সিপাল অফিসার) মোঃ সোহেল রানা দায়িত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানে সাতক্ষীরা অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত এসএমই ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ৭৯ জন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও নারী উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং-২) এর ব্যবস্থাপনায় খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে ১৫-১৬ মে ২০১৬ মেয়াদে Money and Banking Data Reporting শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৪০ জন কর্মকর্তা উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এসবিএস ১, ২ ও ৩ নির্ভুলভাবে রিপোর্টিং করাসহ এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ সিস্টেমে রিপোর্টিং সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বিবিটিএ'র উপমহাব্যবস্থাপক এস এম আব্দুল হাকিম কর্মশালার কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছাড়াও এ কর্মশালায় সেশন পরিচালনা করেন পরিসংখ্যান বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক নবদ্বীপ চন্দ্র বিশ্বাস এবং উপপরিচালক মোঃ খোরশেদ আলম।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ও সমাপনী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। এছাড়া উদ্বোধনী দিনে বিশেষ অতিথি হিসেবে মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে) এস, এম, হাসান রেজা এবং সমাপনী দিনে মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। উভয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সর্দার। কোর্সের স্থানীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং ২) এর উপপরিচালক মোঃ মোকাদ্দাসুল আলম।

প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ প্রেক্ষিত এসএমই ও কৃষি ঋণ

সৈয়দ নূরুল আলম

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বদলে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকিং খাতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। হাতে নেয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশ ব্যাংককে আধুনিক ও ডিজিটাইজড কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য প্রণীত হচ্ছে নতুন নতুন নীতিমালা। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্ধারণ করেছে ১৭টি লক্ষ্য। আর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ সারা বিশ্বের সরকার, সুশীল সমাজ, সাধারণ মানুষ সবাইকে নিজনিজ অবস্থানে থেকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে। ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে প্রথম ও প্রধান তিনটি লক্ষ্য হচ্ছে- ১. দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা, ২. খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা ও ৩. সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। এ প্রধান তিনটি লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও কৃষি ঋণ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) বাস্তবায়নের অনেকটা কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে।

দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা

বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৮৪ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যসীমার মধ্যে বাস করছে। এসব মানুষের অধিকাংশেরই বাস এশিয়া ও আফ্রিকায়। জাতিসংঘের তথ্য মতে, দারিদ্র্যের কারণে বিশ্বে বর্তমানে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রতি সাতটি শিশুর মধ্যে একটি শিশুর উচ্চতা বয়সের তুলনায় অনেক কম। এই শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে, এদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য বাড়ে। শিক্ষাসহ মৌলিক সেবা থেকেও এরা বঞ্চিত। তবে সম্প্রতি জাতিসংঘ আরেকটি তথ্য দিয়েছে, ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে, যা আশাব্যঞ্জক। এটি একটি অসাধারণ অর্জন হলেও এখনো বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন চরম দরিদ্র (যাদের দৈনিক আয় মাত্র ১ ডলার ২৫ সেন্ট বা আরো কম)। এর চেয়ে একটু বেশি আয় নিয়ে জীবনধারণ করতে হচ্ছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে। এছাড়া আরো একটি জনগোষ্ঠী আছে, যাদের আর্থিক অবস্থা এক সময় খানিকটা ভালো ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা আবার দারিদ্র্যের বলয়ে ফিরে গেছে। পৃথিবীতে আয়তনে ক্ষুদ্র, রাজনৈতিক সংঘাত কবলিত দেশগুলোতেই দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি। রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে গত ২০১৪ সালে প্রতিদিন ৪২ হাজার মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের খোঁজে অন্যত্র চলে গেছে। জাতিসংঘ বলেছে, দারিদ্র্যের কারণে মানুষের জীবন-জীবিকায় ব্যাঘাত ঘটে, ক্ষুধা ও অপুষ্টির মাত্রা বেড়ে যায়। শিক্ষাসহ মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের পরিমাণ কম হয় এবং সামাজিক বৈষম্য বাড়ে। সেজন্য জাতিসংঘ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার পরামর্শ দিয়েছে; যাতে মানুষের কর্মসংস্থান টেকসই হয় এবং সমাজে সাম্যতা বৃদ্ধি পায়। ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনে সাত নির্দেশক বা লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

- পৃথিবীর সর্বত্র চরম দারিদ্র্যকে একেবারে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা,
- নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে যারা যে পর্যায়ের দারিদ্র্যের মধ্যেই থাকুক না কেন, তাদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা,
- সংশ্লিষ্ট দেশের উপযোগী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি হাতে নেওয়া; যাতে দরিদ্র ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানুষের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে,
- দারিদ্র্য ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানুষের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, মৌলিক সেবাসমূহ, জমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, নতুন প্রযুক্তি, ক্ষুদ্রঋণসহ আর্থিক সেবায় সমান অধিকার নিশ্চিত করা,
- দারিদ্র্য ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানুষকে আর্থসামাজিক, জলবায়ু ও পরিবেশগত বিপর্যয় এবং দুর্যোগজনিত অভিঘাত থেকে রক্ষা করা,
- বিভিন্ন উৎস থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করা; যাতে এসডিজি অর্জনের নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা যায়,
- জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দরিদ্রমুখী ও নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল ও সুসমন্বিত নীতি-কাঠামো প্রণয়ন করা।

ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা

টেকসই উন্নয়নের দ্বিতীয় লক্ষ্য হ'ল- খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা। বর্তমান বিশ্বের প্রতি নয়জনে একজন অপুষ্টির শিকার। সেই হিসাবে অপুষ্টির শিকার মোট জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৭৯ কোটি ৫০ লাখ। এই জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশের বসবাস এশিয়া মহাদেশে। সারা বিশ্বে প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ালেখা করে এমন ৬ কোটি ৬০ লক্ষ শিশু পেটে ক্ষুধা নিয়ে স্কুলে যায়। আবার বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ লোকের কর্মসংস্থান কৃষি থেকে আসে। কৃষিকাজে নারীর গুরুত্ব তুলে ধরে জাতিসংঘ বলছে, কৃষিতে নারীরা যদি পুরুষের মতো সমানভাবে অংশ নেয়, তাহলে বিশ্বে ক্ষুধার্ত লোকের সংখ্যা ১৫ কোটি পর্যন্ত কমতে পারে।

২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা দূরীকরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করে কৃষিতে টেকসই উন্নয়নের জন্য আগামী ১৫ বছরে মোট আটটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হ'ল-

- সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু থেকে শুরু করে খাদ্য নিরাপত্তা এবং ঝুঁকিতে থাকা সব মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে হবে,
- অপুষ্টির শিকার পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে, গর্ভবতী ও বুকের দুধ দানকারী নারী এবং বয়স্ক ব্যক্তিসহ সব মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ,
- ক্ষুদ্র আকারে খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষকদের কৃষি উৎপাদন ও কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা। নারী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পশু পালনকারী, জেলেদের মতো জনগোষ্ঠীর জন্য ভূমি নিরাপত্তা, শিক্ষা, আর্থিক লেনদেনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার উৎস নিশ্চিত করা,
- টেকসই কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কৃষি উৎপাদনে পরিবেশের ভারসাম্য নিশ্চিত করে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিকূল আবহাওয়া, বন্যা, খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে জনসাধারণ টিকে থাকতে পারে, তা নিশ্চিত করা,
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বীজ এবং চারার মজুদ গড়ে তুলে ২০২০ সালের মধ্যে বীজ, শস্য, গৃহপালিত পশুর জিনগত বৈচিত্র্য রক্ষা করা এবং এর সুফল ছড়িয়ে দেয়া,
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষিভিত্তিক গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মধ্য দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করা,
- বিশ্ব কৃষি বাজারে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা ঠেকানো ও দোহা রাউন্ড অনুযায়ী বিভিন্ন ভর্তুকি উঠিয়ে নেওয়া এবং
- বিশ্ব খাদ্যপণ্যের বাজারে দাম স্থিতিশীল ও ক্রেতার হাতের নাগালের মধ্যে রাখতে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ।

সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা

১৭টি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যের তৃতীয় লক্ষ্য হ'ল- সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সুস্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি এবং জীবনঘাতী বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে শিশু ও প্রসূতি মায়ের মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে গত দুই দশকে অনেক সাফল্য এসেছে সারা বিশ্বে। উন্নতি হয়েছে সুপেয় পানি, স্যানিটেশনের ক্ষেত্রেও। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, পোলিও এবং এইচআইভি এইডসের মতো রোগের বিস্তার প্রতিরোধে সাফল্য এলেও এসব রোগে মৃত্যু পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। তাই জাতিসংঘ মনে করছে, মৃত্যু বন্ধে এখনো অনেক দূর যেতে হবে বিশ্বকে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

বিশ্বজুড়ে শিশুমৃত্যুর উচ্চহারকে একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশ্বে এখনো প্রতিবছর পাঁচ বছরের কম বয়সী ৬০ লাখ শিশু মারা যায়। বিশেষ করে আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় শিশুমৃত্যুর এ হার অনেক বেশি।

১৯৯০ সালের পর থেকে বিশ্বে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমে এসেছে। পূর্ব এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় এমন মৃত্যুর সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ কমে গেছে।

২০১৩ সাল শেষে বিশ্বে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৫০ লাখ। এ সময়ে বিশ্বজুড়ে ২ লাখ ৪০ হাজার শিশু নতুন করে এইচআইভি সংক্রমণের শিকার হয়েছে। আফ্রিকায় ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ এইডস। যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগ প্রতিরোধে অনেক সাফল্য এলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে এ দুটি রোগে মৃত্যুর হার এখনো বেশি। লক্ষ্যসমূহ-

- ২০৩০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু হার ৭০-এ নামিয়ে আনা (প্রতি লাখে),

- ২০৩০ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৫-এ নামিয়ে আনা,
- ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়ার পাশাপাশি অবহেলিত উষ্ণমণ্ডলীয় রোগ, হেপাটাইটিস, পানিবাহিত ও অন্যান্য ছোঁয়াচে রোগমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা,
- মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে মাদকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করা,
- ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা। ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য পরিকল্পিত পরিবার পরিকল্পনা নিশ্চিত করা,
- বিশ্বব্যাপী সবার জন্য উন্নত চিকিৎসা, ওষুধের সরবরাহসহ সার্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ২০৩০ সালের মধ্যে বায়ু, পানিসহ পরিবেশ দূষণজনিত মৃত্যু ও অসুস্থতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা,
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাঠামো অনুযায়ী বিশ্বের সব দেশে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা,
- বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক তৈরিতে গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা বাড়ানো। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণের জন্য ওষুধ ও প্রতিষেধক প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ,
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ। উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর স্বাস্থ্য খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং
- উন্নয়নশীল দেশগুলোসহ বিশ্বের সব দেশের স্বাস্থ্যবিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঝুঁকি মোকাবিলার সামর্থ্য বাড়ানো।

জাতিসংঘ সারা বিশ্বে টেকসই উন্নয়নে নির্ধারণ করেছে ১৭টি লক্ষ্য

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে কৃষি। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি)) কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১৬ শতাংশ। এছাড়া, সার্বিক জিডিপিতে কৃষি খাতের পরোক্ষ অবদান রয়েছে। কৃষক ও কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে এই খাতের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, দেশের খাদ্য শস্যের চাহিদার প্রায় ৯৫% সরবরাহ করে এদেশের কৃষক। এখনও শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকও খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিশ্চিত-করণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কৃষিকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিবান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কৌশল গ্রহণের ফলে বিগত পাঁচ অর্থবছরে গড়ে ৬.২ শতাংশ (২০১৫-১৬ জাতীয় বাজেট অনুযায়ী) জিডিপি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ যেমন, কৃষি ঋণের সহজপ্রাপ্যতা, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃষি খামার স্থাপন, খামার যান্ত্রিকীকরণ, একটি বাড়ি একটি খামার কার্যক্রম ইত্যাদি কৃষিখাতকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিতেও কৃষির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, বাংলাদেশের পল্লি এলাকায় বেশিরভাগ জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় হচ্ছে কৃষি ও গ্রামীণ আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড। তাই, জাতিসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে (এসডিজি) যে ১৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তার মধ্যে দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলা, কৃষি ও পল্লি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমেই সম্ভব। এছাড়া, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পল্লি এলাকায় আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড প্রসারের মাধ্যমে অধিকতর স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো মজবুত করাও সম্ভব। আর কৃষি ও পল্লি খাতের উন্নয়নের জন্য কৃষি ও পল্লি ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এছাড়া, বিদ্যমান খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি বজায় রেখে খাদ্য মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বাস্তবায়নেও কৃষি ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা (২০১৫-২০১৬)

দেশের সকল বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য স্ব-স্ব ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রিমের ন্যূনতম ২.৫ শতাংশ কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের এ লক্ষ্যমাত্রা আবশ্যিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। যে সকল ব্যাংক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অক্ষম হবে তাদের অর্থবছর শেষে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমপরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে জমা করতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত জমাকৃত অর্থের ওপর কোনরূপ সুদ প্রদান করবে না।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি ঋণের প্রধান (core) ৩টি খাতে (যথা-শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে,

সম্ভাব্য যোগ্য ঋণগ্রহীতা কৃষকদের জন্য কৃষি ঋণের আবেদনপত্র সহজলভ্য করতে হবে,

কৃষকদের ঋণ আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার করতে হবে। কৃষি ঋণের জন্য কৃষকদের কোনো ঋণ আবেদন বিবেচনা করা না গেলে ঋণ না পাওয়ার কারণ উল্লেখ করে পত্রের মাধ্যমে কৃষককে জানাতে হবে। পরে তা একটি ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে,

আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয় সে জন্যে আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সহায়ক কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য গ্রাহককে জানাতে হবে,

শস্য ও ফসল চাষের জন্য ঋণের আবেদন দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণের আবেদন নিষ্পত্তিকরণের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ১০ কর্মদিবস।

দশ টাকায় খোলা কৃষক অ্যাকাউন্টসমূহের মাধ্যমে স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে ইতোমধ্যে উক্ত অ্যাকাউন্টের সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ডেবিট/ ক্রেডিট স্থিতির ক্ষেত্রে আবগারি শুল্ক কর্তন হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত হিসাব ব্যবহারে গতিশীলতা আনয়নে বিগত ৬ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে একটি সার্কুলার লেটার জারি করা হয়। বিবরণীভিত্তিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকের ১০ টাকার হিসাবের প্রকৃত ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে থাকে,

কৃষক পর্যায়ে সময়মতো কৃষি ঋণ পৌঁছানোর স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি শস্য/ফসল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ১.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি ইনক্যোয়ারি প্রয়োজন হবে না,

অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরন অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপন্ন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area approach পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে,

কৃষি ঋণ সুবিধায় বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থের যোগান দেয়া কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমনঃ চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে,

কৃষি ঋণ বিতরণে আরো স্বচ্ছতা আনতে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন,

প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে,

প্রকৃত ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষিদের সহজ পদ্ধতিতে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে কৃষি ঋণ দিতে হবে,

কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে শস্যগুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করতে হবে,

সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের অনুসরণ করে অন্য কৃষকরাও উৎসাহিত হয়,

ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষে সরকার প্রদত্ত সুদ ক্ষতির বিপরীতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সুষম অংশগ্রহণ এবং একই সাথে বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যাতে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদহার গত ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ৪ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে এসব ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের রেয়াতি সুদহারে ঋণ প্রদান করতে হবে। ব্যাংকসমূহ যাতে দ্রুত ভর্তুকি সুবিধা পায় এজন্য ভর্তুকি প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজীকরণ করা হয়েছে,

- একজন কৃষক কৃষির অপর কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে

একই কৃষককে ডাল, তৈলবীজ, মসলাজাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে রেয়াতি ৪ শতাংশ সুদহারে ঋণ দেওয়া যাবে,

- কৃষির সহায়ক খাত হিসেবে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতিতেও ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করতে হবে,
- সোলার হোম সিস্টেম এবং সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন খাতে ঋণ প্রদান করতে হবে,
- কৃষি এবং এর সহায়ক খাতের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করতে নানাবিধ আত্মকর্মসংস্থানমূলক বা আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে একক বা দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,
- কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে,
- কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবে দেখা হবে। ফলে, এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ক্যামেলস্ রেটিংয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর সাফল্যকেও বিবেচনা করা হবে। Agri Financing Performance কে CAMELS এর "M" অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা বা Management Component এর রেটিং এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শস্য খাতে ঋণ বিতরণ, ৪% রেয়াতি হারে ঋণ বিতরণ, নিজস্ব শাখার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হারকে বিবেচনা করা হবে। বিশেষ তারল্য সমর্থনের ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণ কার্যক্রমে পারদর্শী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার পাবে,
- প্রতিটি জেলায় ডেপুটি কমিশনারদের নেতৃত্বে গঠিত জেলা কৃষি ঋণ কমিটিকে আরো সক্রিয় করতে হবে,
- জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় বেসরকারি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মনোনীত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এর অনুমোদনপ্রাপ্ত এমএফআইসমূহের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর অনুসরণের জন্য প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে,
- কৃষি ও পল্লি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় আউটসোর্সিংয়ের ব্যবহার করা যাবে,
- কৃষি ও পল্লি ঋণ শতভাগ বিতরণ ও আদায়ের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপসহ কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে,
- উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে,
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় কিছুটা পরিবর্তন আনার পাশাপাশি লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসল চাষ, জলাবদ্ধ ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় পানিসহিষ্ণু ফসল চাষ, খরাপ্রবণ এলাকায় খরাসহিষ্ণু ফসল চাষের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহজে অভিযোজনকারী ফসল চাষের উদ্যোগে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে,
- দেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ চাষিদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে। সরকার প্রদত্ত সুদ ক্ষতি পুনর্ভরণ লবণ চাষের জন্য লবণ চাষিদের রেয়াতি সুবিধায় ৪ শতাংশ সুদহারে ঋণ প্রদান করা যাবে।
- কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্ব স্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে,
- কৃষি ঋণের জন্য যাতে তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় সে লক্ষ্যে ঋণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনে স্ব স্ব ব্যাংকে পৃথক Recovery cell গঠন করতে হবে।
- অনাবাদি জমিতে শস্য আবাদের ক্ষেত্রে কৃষককে ঋণ প্রদানের অগ্রাধিকার দিতে হবে,

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত এসএমই উদ্যোগসমূহ

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) এবং বর্তমান সরকারের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার 'রূপকল্প' বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক কয়েক বছর ধরে প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের ধারা অক্ষুণ্ন রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক ব্যাংকিং, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক নতুন ধারা অব্যাহত রেখেছে। জনজীবনে আর্থিক সেবার আরো প্রসার ঘটানো অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য। এজন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষদের আর্থিক সেবার আওতায় আনা হচ্ছে। ব্যাংক শাখা খোলার জন্য অর্ধেক শাখা পল্লি বা গ্রামে স্থাপনের কৌশলগত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে ব্যাংক শাখা নেই, সেখানে এনজিও লিঙ্কেজ বা এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষক, গরিব ও অসহায়দের মাত্র দশ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। বর্গাচাষি ও নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাসহ কৃষি, এসএমই ও উৎপাদনমুখী পরিবেশবান্ধব খাতে অর্থায়ন প্রসারে বেশ কয়েকটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করা হয়েছে। কৃষি, ক্ষুদ্র, মাঝারি, নারী উদ্যোক্তা ও সবুজ ব্যাংকিংয়ের বিকাশ আজ সহজেই দৃশ্যমান। জনস্বার্থে মোবাইল ব্যাংকিং, স্কুল ব্যাংকিং, সিএসআর, গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের মতো নানা সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে- যা দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে বিশেষ করে তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা, প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তা, সুবিধাবঞ্চিত নারী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে এবং সহজ শর্তে ঋণ ও আনুষঙ্গিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশকে দ্রুত উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে সম্প্রতি সুবিধাবঞ্চিত চারটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ যেমন তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা, প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তা, সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তা ও রাখাইনসহ সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ প্রদান করতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ ধরনের উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই পুনঃঅর্থায়ন তহবিলেরও আওতাভুক্ত করা হয়েছে। আর এই নির্দেশনার আলোকেই আজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৃতীয় লিঙ্গ, শারীরিক প্রতিবন্ধী, রাখাইন নৃগোষ্ঠী ও বিশেষ শ্রেণির নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনা তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় একটি

এসএমই পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত নারীরা ঋণ গ্রহণ করছে

প্রতিষ্ঠানকে এক কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক দিয়েছে যা প্রতিষ্ঠানটি ১৩৬ জন সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তার মাঝে বিতরণ করবে, যার মধ্যে তৃতীয় লিঙ্গের দশজন উদ্যোক্তাকে ৫ লাখ টাকা, ১০৫ জন শারীরিক প্রতিবন্ধীকে ৮৪.৫০ লাখ টাকা, সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত কয়েকজন নারীকে ৩ লাখ টাকা এবং রাখাইন নৃগোষ্ঠীর ১০ জন খুদে উদ্যোক্তাকে ৭.৫০ লাখ টাকা ঋণ দেয়া হবে। এ ঋণের বিপরীতে কোনো সহায়ক জামানত লাগবে না। এটি মানবিক ব্যাংকিংয়ের এক অনন্য উদাহরণ।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের সামনে এখন অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ। প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হ'ল- বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় করা, অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সম্পদের প্রাপ্যতা, বস্তুনিষ্ঠ পরিসংখ্যান ও তদারকি এবং কাঠামোগত কৌশল ও বাস্তবায়ন। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে আবার খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এসডিজিতে কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক মোট দেশজ উৎপাদনকে (জিডিপি) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এসডিজিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ১৯৩টি দেশের জন্য অভ্যন্তরীণ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আলাদা লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ দুটি লক্ষ্যই এসডিজির বিশেষত্ব।

অনেকে মনে করেন যেহেতু এসডিজি বাস্তবায়নে অর্থায়নের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি উন্নত দেশগুলো, তাই অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের দিকে বেশি মনোযোগী হতে হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের হার জিডিপির ১২ দশমিক ১ শতাংশ। এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে যে লক্ষ্যের প্রতি বেশি জোর দেয়া দরকার সেগুলো হলো- স্বাস্থ্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, অবকাঠামো, বৈষম্য, নগরায়ন, টেকসই ভোগ ও উৎপাদন, সমুদ্রসম্পদের ব্যবহার, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময়তা ও সুশাসন।

এসডিজিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ জোর দিয়ে ১৯৩টি দেশ নিজেদের ভূখণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এতে করে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রসারিত হয়েছে। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এতদিন যে উন্নয়নকে আয়ের হিসেবে দেখা হত, এসডিজিতে তা মানবাধিকারের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে।

অবশেষে বলা যায়, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে সময়োপযোগী ও উচ্চাভিলাষী বৈশ্বিক কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। তবে এমজিডির সার্থক বাস্তবায়নের মতো এসডিজি বাস্তবায়নে আগামী ১৫ বছর বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আর এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সব ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে যার যার অবস্থান থেকে।

■ *লেখক : ডিজিএম ও অনুষদ সদস্য, বিবিটিএ*

নারীর কর্মসংস্থান ২০০ কোটি টাকার আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

দ্বিতীয় পর্ব

কুমিল্লা জেলা, লাকসাম উপজেলা

পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে নিয়ে কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আশকামতা গ্রামের রোকেয়া বেগম ও উমর ফারুকের সংসার। কর্মসংস্থানের খোঁজে তিন ছেলে ঢাকায় আসে। বড় মেয়ের বিয়ের পর দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে কোনোরকমে দিন পার করেছেন এই দম্পত্তি। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ চালাতে কাঠখড় পোড়াতে হয়। প্রতিবেশীর কাছ থেকে জানতে পারেন ব্যুরো বাংলাদেশ অনেক কম সুদে ও বিনা জামানতে ১০ টাকার হিসাবধারীদের ঋণ বিতরণ করছে। রোকেয়া বেগম ব্যুরো বাংলাদেশের লাকসাম শাখায় যোগাযোগ করে রূপালী ব্যাংক লিঃ এর দৌলতগঞ্জ শাখায় ১০ টাকায় নিজের একটি ব্যাংক হিসাব খুলে ৫০,০০০ টাকার ঋণ নেন।

ঋণের টাকা সবজি চাষে বিনিয়োগ করার পর অবশিষ্ট টাকায় একটি গরু কেনেন রোকেয়া বেগম। রোকেয়া বেগম ও তার স্বামীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সবজির পাশাপাশি মরিচের ফলন বেশ ভালো হয়। এবার সবজি বিক্রি করে সুখের মুখ দেখেন রোকেয়া ও তার পরিবার।

কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আশকামতা গ্রামের নিবাসী আনোয়ারা বেগম। হঠাৎ করেই স্বামী হারুন রশিদ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। চাষ উপযোগী কিছু জমি ও বাড়ি লাগোয়া একটি চায়ের দোকান থাকলেও ছিল না নগদ অর্থ। বোরো মৌসুম অথচ জমিতে চাষ দিতে পারেননি টাকার অভাবে। ঠিক তখনি ব্যুরো বাংলাদেশ নামের এমএফআইয়ের কাছ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের কথা জানতে পারেন তিনি।

এরপর রূপালী ব্যাংক লিঃ এর দৌলতগঞ্জ শাখায় ১০ টাকায় নিজের একটি ব্যাংক হিসাব খুলে স্বল্প সুদে ৫০,০০০ টাকা ঋণ নেন। এর মধ্যে কিছু টাকায় তিনি বোরো ধান চাষ করেন। আর কিছু টাকায় চায়ের দোকানটিকে বড় করেন। সেখানে চকলেট, বিস্কুট, লবণ, হলুদ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেখে দোকানটিকে মুদির দোকানে পরিণত করেন। বোরো ধানের ফলন ভালো না হলেও আলো দেখায় মুদি দোকানটি। দোকানে বেচাকেনা ভালো হওয়ায় সেটাকে আরেকটু বড় করে কয়েকটি চেয়ার টেবিল দিয়ে ছোটোখাটো একটি খাবার হোটেলে পরিণত করেন। অসুস্থ স্বামী দোকানের দেখাশুনা করেন। দোকানের আয় দিয়ে ভালোভাবেই শোধ করেন ঋণের কিস্তির টাকা। আর বোরো ধান বিক্রির টাকা দিয়ে বড় ছেলেকে বিদেশে পাঠান আনোয়ারা বেগম। এছাড়া দুই মেয়ে ও আরেক ছেলে পড়াশোনার পাশাপাশি তাকে দোকান ও হোটেল পরিচালনায় সাহায্য করে। সম্প্রতি তার ১০ টাকার হিসাবে বিদেশ থেকে ছেলে ৪০,০০০ টাকা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছে। ছেলের পাঠানো টাকা নিজের ব্যাংক হিসাব থেকে তুলতে পেরে অনেক খুশি আনোয়ারা বেগম। আনোয়ারা বেগমের সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে।

শুধু রোকেয়া বেগম ও আনোয়ারা বেগম নয় বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল হতে ঋণ নিয়েছেন হাসিনা বেগম, রাশেদা বেগম ও রওশন আরা বেগমসহ একই গ্রামের আরো অনেকে।

লক্ষীপুর জেলা, রামগঞ্জ উপজেলা

লক্ষ্মীপুর জেলার চন্ডিপুর গ্রামের বাসিন্দা সেলিনা আক্তারের স্বামী ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিদেশ পাড়ি জমান। বিদেশে গিয়েই হঠাৎ করে দেশে টাকা পাঠানো তার স্বামীর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় সেলিনা আক্তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। কোনো উপায় না দেখে এনসিসি ব্যাংকের রামগঞ্জ শাখায় ১০ টাকায় নিজের একটি হিসাব খুলে ৫০,০০০ টাকা ঋণ নেন। সেলিনা আক্তার ঋণের টাকায় প্রথমে ১০,০০০ টাকার কবুতর কিনেন এবং পরবর্তী সময়ে খামারটি সম্প্রাসারণের জন্য আরো প্রায় ৪০,০০০ টাকার কবুতর ক্রয় করেন। কবুতরের খাবার ও ঔষধ মিলে তার মাসিক প্রায় ৩,০০০ টাকা ব্যয় হয়। প্রথমে তিন জোড়া দিয়ে শুরু করে মাত্র এক বছরের মধ্যেই বর্তমানে তার খামারে ২২ জোড়া কবুতর আছে যার বাজার মূল্য ১,০০,০০০ টাকা। বর্তমানে সেলিনা আক্তারের খামারে ম্যাগপাই, সর্টফেস, সিরাজ, মুক্ষী, ঘিয়াসুন্নী ও বিভিন্ন দেশি জাতের কবুতর রয়েছে। কবুতরের খামারের আয় দিয়ে সেলিনা আক্তার যথাযথভাবে ব্যাংকের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছেন এবং পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করছেন।

লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে পারভীন বেগম। স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ী স্বামীর সীমিত আয়ে তিন ছেলেমেয়ের পড়াশোনা ও সংসারের খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই সংসারের হাল ধরতে স্বনামধন্য এনজিও থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে বিউটি পার্লার চালু করেন। কিন্তু ছোট এই বিউটি পার্লারের স্বল্প আয় দিয়ে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন সময়ে তিনি বাড়ি সংলগ্ন এনসিসি ব্যাংকের রামগঞ্জ শাখায় ১০ টাকায় হিসাব খুলে ৫০,০০০ টাকা ঋণ নেন। পূর্বের ঋণ শোধ করে বিউটি পার্লারের পরিসর আরো বৃদ্ধি করেন। দুই বছরের মাথায় তার ছোট ব্যবসাটি একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। এখন তার পার্লারে দু'জন বিউটিশিয়ান কাজ করছে এবং খরচ বাদ দিয়ে মাসে প্রায় ২০-২৫ হাজার টাকা মুনাফা হয়। এ আয় দিয়ে পারভীন বেগম ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করার পাশাপাশি পরিবারের ব্যয়নির্বাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেনও এমনকি স্বামীর ব্যবসায়ে পুঁজি দিয়ে সহায়তা করছেন।

ফরিদপুর জেলা, আলীপুর উপজেলা

রহিমা বেগম (ফেলী) একজন মুদি ব্যবসায়ী। একতলা টিনশেড দোকানের একপাশে চা বানানোর ব্যবস্থা আর অন্যপাশে মুদি-মনোহারী ও কিছু কনফেকশনারি দ্রব্য বিক্রি করেন রহিমা বেগম। ফেলী নামে পরিচিত পরিশ্রমী এই নারী ১৪ বছর আগে বিধবা হয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এক ছেলে আর দু'মেয়েকে লালন পালন ও জীবনযাপনের ব্যয় নির্বাহের চিন্তায় ফেলী দিশেহারা হয়ে পড়েন। ভরসা ছিল স্বামীর রেখে যাওয়া ছোট্ট মুদির দোকান আর নিজের মনোবল। তাই দিয়ে শুরু করেন ফেলী তার সংগ্রামী জীবনের পথচলা। এরই মধ্যে দু'মেয়েকে বিয়েও দিয়েছেন তিনি। ছেলে, এক মেয়ে ও নাতিসহ ফেলীর এখন চারজনের সংসার। মাধ্যমিক পাশ করা ছেলে বর্তমানে ভ্যানে করে প্রাণ-আরএফএল কোম্পানির মালামাল সরবরাহ করছে জীবিকার প্রয়োজনে। ইচ্ছে আছে মায়ের দোকানের পাশে ফ্লেক্সিলোডের ব্যবসা শুরু করার। ফেলীর হাতের চায়েরও বেশ সুনাম আছে। মুদি দোকানের পাশেই একটি ছোট হোটেল শুরুরও প্রস্তুতি নিয়েছে ফেলী। বর্তমানে ফেলী একজন মোটামুটি স্বচ্ছল নারী। তিনি স্বপ্ন দেখেন এই ব্যবসাকে আরো বড় করবেন। ছেলের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করে তার জীবনকে সমৃদ্ধ করাই এখন ফেলীর লক্ষ্য।

পল্লিকবি জসীম উদ্দীনের বাড়ির এলাকা সংলগ্ন খেওয়াঘাট, ধুলদি, গোবিন্দপুরের ফিরোজা বানু একজন লাকড়ি ব্যবসায়ী। চারবছর আগে নিজ বাড়ির সম্মুখভাগের একপাশে ফিরোজা বানু শুরু করেছেন এই লাকড়ি (কাঠের) ব্যবসা। স্বামীর সাথে কাঁধ মিলিয়ে এই সাহসী নারী নিজেও এখন উপার্জন করছেন। স্বামীর পাশাপাশি সংসারের খরচ যোগানোর জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন এই পেশা। তবে আনন্দও তার কম নয় এ কাজে। নিজে উপার্জন করে সংসারের খরচ যোগানোর মধ্যে যে অন্য রকম আনন্দ আছে তা তিনি আগে উপলব্ধি করতে পারেননি। তিন ছেলে দুই মেয়ের মধ্যে বর্তমানে বেঁচে আছে দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলের অকাল মৃত্যুতে তার সংসারের দায়িত্বও এখন ফিরোজা বানুর কাঁধে। ছেলে মেয়ে সবাই বিবাহিত। স্যানিটারি ব্যবসায়ী ছোট ছেলে তার স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আলাদা সংসার করছে। ফিরোজা বানু নানারকম গাছ কিনে তা দিয়ে দুই ধরনের কাঠ তৈরি করেন। এক ধরনের কাঠ ফার্নিচার তৈরির উপযোগী এবং অবশিষ্ট কাঠ লাকড়ি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। ফার্নিচার তৈরির উপযোগী কাঠ একটু বেশি দামে বিক্রি হলেও লাকড়ি বিক্রি হয় ২০০ টাকা মণ দরে। সব মিলিয়ে ফিরোজা বানু প্রতিদিন ২-৩ হাজার টাকার কাঠ বিক্রি করেন। এরই মধ্যে নারী উন্নয়ন ফোরাম নামক এনজিও'র সহায়তায় ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিল হতে ৫০,০০০টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে ব্যবসাকে করেছেন আরো সমৃদ্ধ। ঋণ নিয়ে নগদ টাকায় গাছ কিনতে পারায় একটু বেশি লাভে কাঠ বিক্রি করতে পেরেছেন বলে ফিরোজা বেগম এই ঋণ পেয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত। ঋণ পেয়ে কতটা উপকৃত হয়েছেন জানতে চাইলে বেশ আনন্দের সাথে জানালেন তার অনুভূতির কথা। আরো জানালেন গাছ বেশি সংগ্রহ করতে পারলে দৈনিক ২-৩ জন লেবারকেও গাছ কাটার কাজে নিয়োজিত করেন ফিরোজা বেগম। তাতে সব খরচ বাদ দিয়ে প্রতি মাসে ১২-১৫ হাজার টাকা লাভ থাকে। বাড়িতে টিভি এনেছেন। তবে এখনো উন্নতমানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন বসাতে পারেননি। ব্যবসা ভালো থাকলে অতি শীঘ্রই একটা পাকা স্যানিটারি ল্যাট্রিন বসাবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ

তানভীর আহমেদ

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন নবাব আলীবর্দী খাঁর দৌহিত্র। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে সংঘটিত যুদ্ধে পরাজয় এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের সূচনা ঘটে। তাই ঐতিহাসিকভাবে নবাব আলীবর্দী খাঁ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার শাসনকাল এবং পলাশীর যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে বিবেচিত। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায়। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্ষমতার প্রতি মোহ, অর্থের প্রতি লোভ ও চারিত্রিক অধঃপতন ছিল নবাব পরিবারের বৈশিষ্ট্য। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হ'ল যে, শঠতা ও কূটচালের মাধ্যমে নবাব আলীবর্দী খাঁ যেভাবে নবাব সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও হত্যা করেছিলেন ঠিক একইভাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতা ও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

নবাব আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছিলেন মারাঠাদের আক্রমণ মোকাবেলায়। নিজের পরিবারের প্রতি তিনি উদাসীন না হলেও অনেক অযাচিত ঘটনার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। এর মধ্যে সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক আযিমাবাদ-পাটনা অবরোধ অন্যতম। মাতামহ আলীবর্দী দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে দৌহিত্রের এই অবাধ্যতার সমাপ্তি ঘটান। কিন্তু এই ঘোষণা সিরাজকে মসনদপ্রত্যাশী অন্যদের নিকট চক্ষুশূল করে তোলে। এছাড়া রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও ষড়রিপুর জন্য খ্যাত সিরাজকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করার ঘোষণা পরিবারের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের আতঙ্কিত করে তোলে। তবে এ সময় এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যায় যার ফল সিরাজকে ভোগ করতে হয়েছিল। নবাব আলীবর্দী খাঁ তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা নওয়াযিশ মোহাম্মদ খানকে জাহাঙ্গীরনগরের নায়েবে নাযিম নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া তাঁকে সহায়তা করার জন্য আলীবর্দী খাঁ হোসেনকুলী খান নামের তাঁর একজন দক্ষ সভাসদকে নিযুক্ত করেন। নওয়াযিশ মোহাম্মদ খানের স্ত্রীই ছিলেন আলীবর্দী খানের জ্যেষ্ঠা কন্যা মেহের-উন-নিসা যিনি ঘসেটি বেগম বলে পরিচিত। হোসেনকুলী খান জাহাঙ্গীরনগরে না থেকে মুর্শিদাবাদে অবস্থান করে তাঁর দাপ্তরিক কাজ চালাতেন। কিন্তু নায়েবে নাযিমের সাথে সুসম্পর্কের পাশাপাশি তিনি (হোসেনকুলী খান) নায়েবে নাযিমের স্ত্রী ঘসেটি বেগমের সাথেও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলেন যা শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যায়। পরবর্তী সময়ে এ সম্পর্ক সিরাজের মা আমিনা বেগম পর্যন্ত গড়ায়। বিষয়টি নিয়ে নবাব আলীবর্দী খাঁ ও তাঁর স্ত্রী শরফ-উন-নিসা খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। নবাব পরিবারের এ কলঙ্ক মোচনের দায়িত্ব আলীবর্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে দেন। সিরাজ জাহাঙ্গীরনগরের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে হোসেনকুলী খানকে হত্যা করেন। এ ঘটনায় সিরাজের শত্রু ও মিত্র পক্ষ নির্ধারিত হয়ে যায়। বাংলার মসনদে রাজা, সুলতান, সুবেদার ও নবাবসহ যতজন শাসক আরোহণ করেছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন তাদের সবার মধ্যে ব্যতিক্রম। কারণ রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ কম বয়সী সিরাজের দেশপ্রেমে কোনো ঘাটতি ছিল না। তাছাড়া সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি নিজেকে পুরোপুরি পাল্টে ফেলেন। মাতামহ আলীবর্দী খাঁ মৃত্যুশয্যায় তাঁকে যেসব নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে কিছু নির্দেশনা তাঁর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র মাতামহের নির্দেশনার জন্যই সিরাজ তাঁর নিজ পরিবারের বিশ্বাসঘাতক সদস্যদের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন। বাংলার মুঘল সুবেদার শাহ সুজার নিকট থেকে কৌশলে ইংরেজরা ১৬৫১ সালে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি আদায় করার পর থেকে তারা বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্য করতে থাকে। এটি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বাংলার সুবেদারদের সাথে ইংরেজদের বিরোধ তৈরি হয়। এ বিরোধ পরবর্তীকালে সংঘর্ষ ও শেষে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব

ইংরেজদের ক্ষমা করে পুনরায় বাণিজ্য করার অনুমতি দিলে ইংরেজরা সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখা শুরু করে। ১৭৫৬ সালের ১৫ এপ্রিল নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার মসনদে আসীন হন এবং তাঁর পূর্ণ নাম ও পদবি হয় নবাব মনসুর-উল-মুলক মির্যা মোহাম্মদ শাহ্ কুলি খান সিরাজউদ্দৌলা হযরত জঙ বাহাদুর। সিংহাসনে আরোহণ করেই সিরাজ বুঝতে পারেন বাইরের শত্রুর আগে তাঁকে ঘরের শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। এদের মধ্যে ছিলেন খালা ঘসেটি বেগম, খালা মোমেনা বেগমের পুত্র পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ ও আলীবর্দী খাঁর বৈমাত্রেয় বোনের স্বামী মীর জাফর আলী খান। এখানে উল্লেখ্য যে, আলীবর্দী খাঁ রাস্তা থেকে তুলে এনে মীর জাফরকে নিজের বোনের সাথে বিয়ে দেন। তাছাড়া তাঁকে উড়িষ্যার নায়েবে নাযিম নিয়োগ করা হলে কাপুরুষতার কারণে তিনি সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। এরপর তাকে সেনাবহিনীর প্রধান বখশি ও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করা হয়। আলীবর্দী খাঁর জীবদ্দশায় মীর জাফর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিকবার বিদ্রোহ করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ফলে আলীবর্দী খাঁ তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু পরে নবাব পরিবারের সদস্যগণের অনুরোধে তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করেন। এখানে লক্ষণীয়, দূরদর্শী আলীবর্দী খাঁ আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে যদি হোসেনকুলী খানের ন্যায় একই ব্যবস্থা মীর জাফরের বিরুদ্ধেও নিতেন তাহলে পরে বাংলার ইতিহাস পাল্টে যেত। সিরাজউদ্দৌলা মসনদে বসেই প্রশাসনে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসেন। মীর জাফরকে সেনাবাহিনীর প্রধান বখশির পদ থেকে সরিয়ে মীর মদনকে সেখানে নিয়োগ দেন। এছাড়া মোহনলালকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হয়। এরপর সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের কলকাতায় অবস্থিত কাসিমবাজার কুঠির ব্যাপারে মনোযোগী হন। কারণ সিরাজউদ্দৌলা তাদের এদেশে কেবল বণিক ছাড়া আর কিছু ভাবেননি। এ কারণে ১৭৫৬ সালে ২৯ মে কাসিমবাজার কুঠি অবরোধ করা হয়। ফলে ইংরেজরা নবাবের হাতে যুদ্ধাস্ত্র তুলে দিয়ে মুচলেকার মাধ্যমে এ যাত্রায় মুক্তি পায়। এরপরই সিরাজউদ্দৌলা তার খালাতো ভাই পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কারণ মসনদ প্রত্যাশী শওকত জঙ কৌশলে তৎকালীন মুঘল সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী মীর শিহাব-উদ-দীন উমাদ-উল-মূলকের নিকট হতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদারির সনদ লাভ করে নিজেকে নবাব হিসেবে ঘোষণা দেন ও সিরাজউদ্দৌলাকে মসনদ ত্যাগে হুমকি প্রদান করতে থাকেন। ফলে সিরাজউদ্দৌলা তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানেই শওকত জঙের মৃত্যু ঘটে। এদিকে কলকাতার শাসনকর্তা মানিক চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৫৭ সালের ১ জানুয়ারি ইংরেজরা কলকাতা পুনরুদ্ধার করে। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করতে হয়। কিন্তু এ অভিযান পুরোপুরি সফল হয়নি। সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ইংরেজদের সাথে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন যা আলীনগরের সন্ধি বলে খ্যাত। ইতোমধ্যে, ইংরেজরা নবাব পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হয়ে যায়। এ ষড়যন্ত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন জগৎশেঠ। উল্লেখ্য, এই জগৎশেঠের পরিবারই বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাব সরফরাজ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আলীবর্দী খাঁকে সহায়তা করেছিল। ইংরেজরা জগৎশেঠের মাধ্যমে মীর জাফরকে মসনদে বসানোর চূড়ান্ত পরিকল্পনা করে ফেলে। পরিকল্পনায় আরো যোগ দেয় ঘসেটি বেগম, মীর জাফরের পুত্র মীরন, মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিম, রাজা দুর্লভ রায়, উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ, মীর খোদা ইয়ার খান লতিফ প্রমুখ। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ১৭৫৭ সালের ৫ জুন মীর জাফরের একটি গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয় যার ফসল ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তি সম্পাদনের পরই রবার্ট ক্লাইভ পলাশীর প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ ঘটান। সিরাজউদ্দৌলাও তার সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। কিন্তু এ সময় মীর মদনের পরামর্শ উপেক্ষা করে মীর জাফরের কোরআন শরীফে হাত রেখে শপথের বিনিময়ে তাকে পূর্বপদে বহাল করেন। ইংরেজদের সাথে গোপন চুক্তির বিষয়ে সিরাজউদ্দৌলা অবগত হলেও মীর জাফরের অনুগত সেনাদের সংখ্যা ও যুদ্ধাস্ত্রের পরিমাণ বিবেচনা করে তার বিরুদ্ধে তিনি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এর ফলে সবচেয়ে মূল্যবান মুহূর্তে সিরাজউদ্দৌলা সাহসিকতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। অবশেষে ঐতিহাসিক পলাশী যুদ্ধের ক্ষণ ঘনিয়ে আসে। রবার্ট ক্লাইভ ৩ হাজার সেনাসহ অগ্রসর হতে থাকেন। অন্যদিকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা প্রায় ৫০ হাজার সেনাসহ অগ্রসর হন। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েই বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদনের মৃত্যু সিরাজউদ্দৌলাকে হতভম্ব করে দেয়। বারংবার অনুরোধ, অনুনয় ও শেষে নিজের পাগড়ি মীর জাফরের পায়ের নিকট সমর্পণ করেও সিরাজউদ্দৌলা মীর জাফরকে যুদ্ধে সক্রিয় করতে ব্যর্থ হন। এতে সিরাজউদ্দৌলা মীর জাফরের পরামর্শে যুদ্ধ স্থগিতের নির্দেশ দেন। যার কারণে ইংরেজদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টিকারী বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল যুদ্ধ শিবিরে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এতে সিরাজউদ্দৌলার সেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সে সুযোগ ইংরেজ সেনারা গ্রহণ করে। এভাবে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। সিরাজউদ্দৌলা কিছু বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যান। কিন্তু ২৯ জুন তাকে পলাতক অবস্থায় স্ত্রী ও কন্যাসহ আটক করা হয়। এরপর ৩ জুলাই মীর জাফরের পুত্র মীর সাদিক আলী খান মীরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করেন। উল্লেখ্য যে, অনাথ মোহাম্মদী বেগ আলীবর্দী খাঁর স্ত্রী শরফ-উন-নিসার গৃহে লালিত পালিত হয়েছিলেন এবং প্রচুর ধনসম্পদ দান করে তিনি তাকে বিত্তশালী করেছিলেন।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধ। এ যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে সূচনা ঘটে বৃটিশদের ঔপনিবেশিক শাসনের। এ উপলক্ষে বর্তমান সংখ্যায় ইতিহাসনির্ভর এ লেখাটি প্রকাশ করা হ'ল।

সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর সাথে সাথে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যও অস্তমিত হয়। সিরাজের স্ত্রী লুৎফ-উন-নেসা ও তার একমাত্র কন্যা উম্মে যোহরা জাহাঙ্গীরনগরের জিঞ্জিরায় বন্দী জীবন শেষে আট বছর পর মুর্শিদাবাদে ফিরে যান। বহু অনুরোধের পর তিনি খোশবাগে অবস্থিত তার স্বামীর কবর তত্ত্বাবধানের সুযোগ পান। কিন্তু তিনি বেশিদিন বাঁচেননি। এর কিছুদিন পর তাকে তার স্বামীর কবরের পাশে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। সিরাজের কন্যা উম্মে যোহরার সাথে সিরাজের ভাই ইকরাম-উদ-দৌলার পুত্র মুরাদ-উদ-দৌলার বিয়ে হয় এবং তাদের চার কন্যা থেকেই সিরাজের বংশ প্রসারিত হতে থাকে। তবে সম্প্রতি ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক ড. অমলেন্দু দে তার 'সিরাজের পুত্র ও বংশধরদের সন্ধানে' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মোহনলালের বোন মাধবী ওরফে হীরা ওরফে আলেয়ার গর্ভে সিরাজের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। পলাশীর যুদ্ধের পর মোহনলাল সে পুত্রটিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে ময়মনসিংহে আশ্রয় নেন। ময়মনসিংহের জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী পুত্রটিকে দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে আশ্রয় দিতে সম্মতি জানান। পরবর্তীতে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণগোপাল চৌধুরী পুত্রটিকে দত্তক নিয়ে নামকরণ করেন যুগলকিশোর রায়চৌধুরী। কিন্তু কৃষ্ণগোপাল দত্তক নেয়ার সময় জানতেন না যে সে সিরাজের পুত্র।

পলাশীর যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকদের পরিণতি ছিল সিরাজউদ্দৌলার চেয়েও করুণ। মীর জাফরের মৃত্যু হয় দূরারোগ্য কুষ্ঠরোগে। সিরাজের হত্যাকারী মোহাম্মদী বেগের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। এক পর্যায়ে সে কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। মীরনকে ইংরেজরা হত্যা করে গুজব রটিয়ে দেয় যে মীরন বজ্রপাতে মারা গিয়েছে। ঘসেটি বেগমের মৃত্যু হয় নৌকাডুবিতে। জগৎশেঠকে গঙ্গা নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। রাজা দুর্লভ রায়ের মৃত্যু হয় কারাগারে ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে। উমিচাঁদের মৃত্যু হয় কারাগারে। পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা পরোক্ষভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপনিবেশে পরিণত হয়। এরপর ক্রমশ পুরো ভারতবর্ষ বৃটিশদের শাসনাধীনে চলে যায়। মসনদলোভী কিছু ব্যক্তির জন্য পুরো ভারতবর্ষবাসীকে ১৯০ বৎসর বৃটিশদের অধীনে শাসিত হতে হয়। এজন্য পলাশীর যুদ্ধ পুরো ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

■ *লেখক: এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

জোছনাঝরা দিনগুলো

মকবুল হোসেন সজল

চাঁদের সাথে পৃথিবীর সব মানুষের আশৈশব এক সম্পর্ক বিদ্যমান। চাঁদ দেখলেই মানুষ জোছনায় ভিজতে চায়। আলিঙ্গন করতে চায় এর সৌন্দর্যকে। কারণ জোছনার অশরীরী সুন্দরের বিভা মানুষকে আন্দোলিত করেছে যুগে যুগে।

জোছনা শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল চাঁদের আলো, চন্দ্রালোক, চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রিকা, কৌমুদি ইত্যাদি। এই শব্দটি কেউ লেখেন জ্যোৎস্না, কেউ জোসনা, কেউ জোছনা। যে যেভাবেই লিখুকনা কেন এটি উচ্চারিত হতেই মা, খালাদের কাছ থেকে বহুশ্রুত সেই ছড়ার চারটি লাইন স্মৃতির আঙ্গিনায় ফিরে আসে বার বার

আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।

ছোটবেলায় এই মিষ্টি ছড়াটির মাধ্যমে সম্ভবত সব বাঙালির জীবনে চাঁদের প্রবেশ ঘটে এবং কারো কারো বেলায় সারা জীবনই তার প্রভাব থেকে যায়। চাঁদের সাথে পৃথিবীর সব মানুষের আশৈশব এক সম্পর্ক বিদ্যমান। চাঁদ দেখলেই মানুষ জোছনায় ভিজতে চায়। আলিঙ্গন করতে চায় এর সৌন্দর্যকে। কারণ জোছনার অশরীরী সুন্দরের বিভা মানুষকে আন্দোলিত করেছে যুগে যুগে। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের অন্তরে জোছনার আবেদন একই রয়ে গেছে। সারা পৃথিবীর নিবিড় বনভূমিতে আজও যে অপার্থিব চন্দ্রালোক ঝরে পড়ে, বিশাল প্রান্তর হেসে ওঠে শুভ্র মায়ায়, পর্বতের মাথায় আজও যে মুকুট জ্বলে ওঠে, দেখা যায় দিগন্ত রেখার মুখ, সমুদ্র রূপালী আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে, নদীর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে পারাপার করে শুভ্র পারদ - সে সবই মায়াবী জোছনার দান। সূর্য থেকে আলো সংগ্রহ করে চন্দ্র নামক উপগ্রহটি আলোর নরম সাগরে ডুব দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে গাছের পাতার ফাঁকে, জলের স্রোতের মাঝে, সবুজ ঘাসের সাহচর্যে অন্য এক জগৎ সৃষ্টি করে। মানুষ তার মধ্যে অবগাহন করতে করতে এক বিশেষ ভালোলাগা ও ভালোবাসার অনুভবে শিহরিত হয়। জোছনালোক এক মাধুরীময় অধরা যাকে ছোঁয়া যায়না শুধুই অনুভব করা যায়। তেমনি এর সঠিক বর্ণনাও প্রায় অসম্ভব।

আমি গাঁয়ের ছেলে। জন্ম ও বেড়ে ওঠা দু'টোই গ্রামে। তাই জ্ঞান হবার পর থেকে প্রকৃতির সাথে পরিচয়, চাঁদের সাথে সখ্যতা। চাঁদের হাসির বান ডাকা কাকে বলে তা প্রাণ ভরে দেখেছি ছোটবেলাতেই। কখনো বাড়ির আঙ্গিনায়, কখনো পুকুর পাড়ে, কখনো দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ বা রাস্তায় জোছনাস্নাত হয়েছি শত-সহস্র বার। গাছের পাতার ফাঁকে রূপালী থালার মতো চাঁদকে উঁকি মারতে দেখেছি। আবার মধ্যাকাশের চাঁদের জোছনায় বিশ্ব চরাচরকে ভেসে যেতেও দেখেছি ।

জোছনা নিয়ে আমার এত এত স্মৃতি যে কোনটা রেখে কোনটা লিখব তাই ভাবছি। জীবনের প্রতি খাঁজে খাঁজে কতভাবে যে জোছনা মিশে আছে - পূর্ণিমার রঙ মিশে আছে তার হিসেব নেই। এই ছোট্ট জীবনে বহুরাতে বহুভাবে জোছনাস্নাত হয়েছি যা মনে করতে গেলে স্মৃতিগুলো জট পেকে যায়। তবে চাঁদ বা জোছনার প্রসঙ্গ এলে প্রথমেই মনে পড়ে আমার গ্রামের কথা, শৈশব-কৈশোরের কথা। মনে পড়ে চাঁদনী রাতে অনেক দূরের গ্রামে জোছনায় ভিজে নাটক বা যাত্রাপালা দেখতে যাওয়ার কথা। মনে পড়ে রূপবান, আলোমতি বা জরিনা সুন্দরীর পিছে পিছে ছুটে চলার কথা। পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে আর ঘরে থাকতে পারতাম না। চাঁদের টানে নদীতে জোয়ার আসে, তেমনি জোছনাও আমার হৃদয়ে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলত, আজও ফেলে। আমি ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়তাম। জোছনার সাথে মাখামাখি করতে কখনো মাঠে, কখনো পুকুরপাড়ে বা কখনো নদীর ঘাটে যেতাম। সারারাত জাগতাম, ঘুরতাম আর বেড়াতাম। জোছনামাখা গভীর রাতে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতাম বলে অনেকে আমাকে 'রাত জাগা মানুষ' বলত। 'চাঁদে পাওয়া মানুষ'ও বলত কেউ কেউ।

আমাদের বাড়ির পাশের ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তাটা তখন কাঁচা ছিল। জোছনাস্নাত ধবল রাতে ধূলি ধুসর রাস্তায় একা একা দাঁড়িয়ে অপলক চোখে চাঁদ দেখেছি আর জোছনার বিভা শরীরে মেখে নিয়ে স্নান করেছি বহুবার। কীযে ভালো লাগত ! বাড়ির পূর্ব সীমানায় ছিল বিভিন্ন গাছপালায় ভরা বাগান। মেঘমুক্ত পূব আকাশে যখন পূর্ণিমার চাঁদ উঠত, সেই চাঁদের আলো আমাদের উঠানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ত। সম্পূর্ণ আঙ্গিনা আলোময় না হলেও গাছের সবুজ পাতারা চাঁদের আলো খানিক রেখে দিত বলে সেই উঠানকে আল্পনাময় মনে হতো। গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে বারান্দায় বের হয়েই দেখতাম দুধের মতো

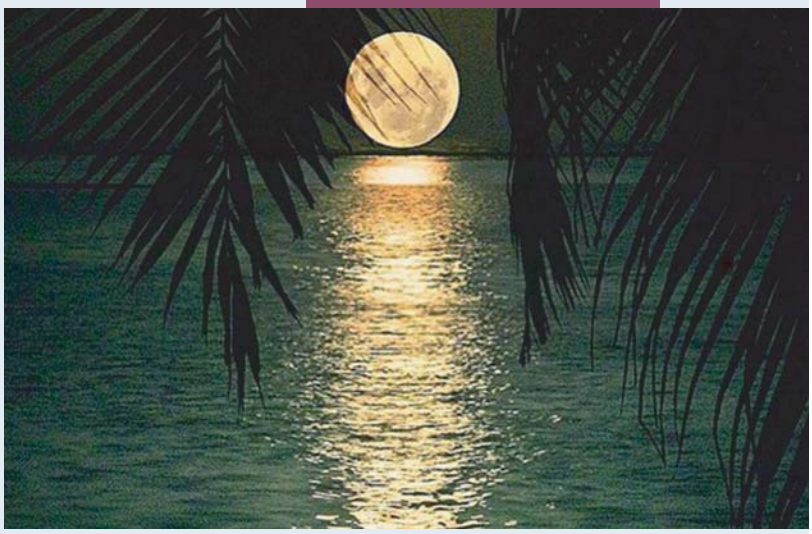

ঝকঝকে চাঁদটা যেন আকাশে নয়, সোমেশ্বরীর জলে ভেসে আছে

সাদা সাদা ফুটফুটে তুলতুলে জোছনা ঝরে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে বাড়িময়। বৃষ্টির মতো জোছনা সমস্ত শরীর মনে জড়াতে নেমে যেতাম উঠানে। ভিজতাম আর ভিজতাম। ভিজতে ভিজতে কখনো কখনো জোছনাময় সাদা পথ ধরে হেঁটে যেতাম ফলিয়ার পাথার বা ঘাঘট পাড়ে। মাছুয়াদের পেতে রাখা ঝাট জালে মাছ ধরা দেখতাম মনের আনন্দে। পুঁটির ঝাঁক জালে ধরা পড়লে মনে হতো টুকরো টুকরো রূপোর দানা ঝলমল করছে। রূপার সে রূপালী রঙ গায়ে মেখে বাড়ি ফিরতাম। জোছনা উপভোগের জন্য একা বা ভাইবোন সবাই মিলে বাড়ির পাশে শান বাঁধানো পুকুর ঘাটে আড্ডা দিয়েছি বহুরাত। গ্রীষ্মে জোছনায় পুকুর থেকে আসা শীতল হাওয়া আর স্বচ্ছ দীঘির জলে জোছনার মায়াবী আলো হৃদয় প্রাণ শরীরকে গভীরভাবে ছুঁয়ে যেত। পুকুর ঘাটের সে উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে কতবার কতক্ষণ বসেছি তার হিসেব নেই। শুধু জানি জোছনায় হারিয়ে গেছি বার বার।

শরতের শুভ্র মেঘের আড়ালে উঁকি দেয়া চাঁদ থেকে দুধ সাদা জোছনা ঝরত তখন। চোখ বুজলেই এখনো ভেসে ওঠে দশমীর মেলা থেকে বাড়ি ফেরার দৃশ্য। মেলায় ঘুরে ঘুরে বাঁশি, বাতাসা, কদমা ইত্যাদি কিনে প্রতিমা বিসর্জন দেখে বাড়ির পথে রওনা হতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যেত। ভয়ে বুক ধুকধুক করত। নদীর তীর ঘেঁষে খোলা চকের রাস্তা ধরে তিন মাইল পথ হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে! কিন্তু পুরান বাজার হয়ে নদীর ধারে আসতেই জোছনার আলোয় শরীর ভিজে সব ভয় কেটে যেত। কীযে রেশমের মতো কোমল জোছনা ! পুরো ঘাঘট নদীটাই ঝলমলিয়ে উঠত। তখন গলা ছেড়ে গান ধরতাম 'আশা ছিল মনে মনে...'। এই ধবধবে জোছনা মাঝে মধ্যে প্রতারণাও করত। শহরের সিনেমা হল থেকে নাইট শো দেখে ধান/গম ক্ষেত ও নদী পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরতাম জোছনা রাতে। শুকনো প্রায় নদীর প্রশস্ত কিনারা ছিল বালির রাজ্য। একদিন ফেরার পথে মধ্য রাতে আমরা তিন বন্ধু উন্মুক্ত ক্ষেত থেকে নদীর দিকে এগুতে থাকি। নদীর তীরে পানির জন্য হাত বাড়াই, বার বার হাতে বালি আসে। আবারও সামনে এগুই, হাত বাড়াই আবারও বালি আসে। এই বালি আর মরা নদীর পানি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছিল ফকফকে সাদা জোছনার প্রত্যক্ষ সহায়তায়; যা মনে হলে এখনো নিজের অজান্তেই হেসে উঠি।

এক ভরা পূর্ণিমায় নেত্রকোনার বিরিশিরি ছিলাম দু'বন্ধু মিলে। সবুজ পাহাড় আর অরণ্যে ঘেরা বিরিশিরি। গভীর রাতে গাঢ় চাঁদের আলোয় সোমেশ্বরীর পাড়ে এসে নদী তীরের বালুভূমিতে জোছনা দেখে স্বচ্ছ জল ভেবে ঝাঁপ দিতেই বালির ধাক্কা। ফের দৌড় ফের ধাক্কা। এভাবে ধাক্কা খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে বালিতে বসে পড়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি চারিদিকে শুভ্র সুন্দর জোছনা গলে গলে পড়ছে। ঝকঝকে চাঁদটা যেন আকাশে নয়, সোমেশ্বরীর জলে ভেসে আছে। যখনই চাঁদটাকে ধরতে গেছি জলের স্রোতে অমনি ডিমের কুসুমের মতো ভেঙ্গে ভেঙ্গে পুরো জলে ছড়িয়ে গেছে। এভাবে কতবার চাঁদকে ধরতে গেছি কতবার তা ভেঙ্গে গেছে মনে নেই। শুধু মনে আছে বিরিশিরির বন-প্রান্তর আর নদীর দুই কূলের সাথে আমরা দু'বন্ধুও ধবল জোছনায় ভাসছিলাম আর ভাসছিলাম।

অনেক বছর আগে কুয়াকাটা যাচ্ছিলাম পাঁচ বন্ধু মিলে। যাত্রা শুরু করি শেষ বিকেলে ঢাকার সদরঘাট থেকে। গন্তব্য জেলা শহর পটুয়াখালী। বুড়িগঙ্গার দুই তীরের সবুজ শ্যামল গ্রাম দেখছি। দেখছি সোনালী শস্য ক্ষেত। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, এরপর রাত। লঞ্চের বারান্দায় আড্ডা দিতে দিতে কেবিনে তাস খেলায় মত্ত আমরা। লঞ্চটা অনেকক্ষণ ধরে চলতে চলতে অনেকগুলো হাট, বাজার, গ্রামগঞ্জ পেরিয়েছে। হঠাৎ রাতের আকাশ আমাদের ডাকল। ছাদে গিয়ে ওপরে তাকিয়ে দেখি আকাশের মাঝখানে সামান্য ক্ষয়ে যাওয়া গোল চাঁদ স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে তাকিয়ে আছে আমাদেরই দিকে। জোছনার ছায়ায় নদীর রূপ পাল্টে গেছে। গাঢ় অন্ধকারের কালো চাদরটা সরিয়ে স্নিগ্ধ আলো মেখে শ্যামলা মেয়ের মতো হাসছে। সেই হাসিতে ভেসে যাচ্ছিল মেঘনার তীরহীন জলরেখা। ঝাঁপিয়ে পড়া আলোয় ভেসে যাচ্ছিল দু'পাশের শস্য ক্ষেত ও নির্জন গ্রাম। চাঁদ তখন সামান্য পশ্চিমে হেলে গেছে। হেলে যাওয়া চাঁদ কী অপরূপ জোছনা ছড়িয়েছে। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে জোছনা দেখছি। দেখছি জোছনা ধোয়া নদী, নদীতে ভাসমান জেলে নৌকা ও গাঙচিল। ঝলমলে জোছনা ছড়িয়ে চাঁদটা একসময় সোনালী রঙ ধারণ করে আরো খানিকটা নিচে নেমে গেল। তখন আমরাও বুকের ভেতর থৈ থৈ আনন্দ নিয়ে নিচে নেমে এলাম।

হাওর অঞ্চলে অসাধারণ সুন্দর জোছনা দেখেছি একবার। এটা কিশোরগঞ্জের ইটনায়। দিগন্ত বিস্তৃত হাওর। বড় গাছপালা কিছুই নেই। বর্ষার সময় শুধু পানি আর পানি হলেও শুকনো মওসুমে বিশাল প্রান্তর। চোখ কোথাও বাঁধা পড়েনা। শুধুই ধূ ধূ মাঠ। চৈত্রের সন্ধ্যায় প্রান্তরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ পর চাঁদ উঠল। জোছনা তীব্র থেকে তীব্রতর হলো, ধবধবে সাদা জোছনায় সীমানা দেখার জন্য দিগন্তের দিকে তাকিয়েছি। পৃথিবী যে গোল তা পরিষ্কার বোঝা গেল। মনে হ'ল গোলকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি; যা জীবনভর মনে থাকবে।

একবার পার্বত্য জেলা বান্দরবানের এক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছি অনেক সময় ধরে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি মাথার কিছু উপরেই একটি রূপার থালার মতো চাঁদ চারপাশে মসৃণ সিল্কের মতো নরম আলো বিছিয়ে এক অপরূপ নেশা ভরা জগৎ সৃষ্টি করেছে। ধবধবে সাদা জোছনাস্নাত সেই মনোরম পরিবেশে আনন্দে স্তব্ধ হয়ে জোছনার মোহর কুড়ালাম আপন মনে। আমার বার বার কেবলই মনে হচ্ছিল জীবনে এরকম চাঁদের বড্ড প্রয়োজন।

দেশের বাইরে দাঁড়িয়েও জোছনার প্লাবন দেখেছি একবার। বছর চারেক আগের এক রাতের কথা। মালয়েশিয়ার পর্যটন দ্বীপ লঙকাভির হোটেল মুতিয়ারার নিজস্ব সমুদ্র সৈকতে আমরা চারজন। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে সমুদ্রের জলে। নারকেল বীথির আরাম কেদারায় বসে গল্প করছি আর জোছনা দেখছি। শুধু জোছনা আর জোছনা। চরাচর জুড়ে এমনই জোছনার প্লাবন যে, আকাশের চাঁদ যেন ভেঙ্গে পড়েছে সাগর পারে। মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছে মাথার ওপরের সুবিশাল চাঁদ থেকে পুষ্পরেণুর মতো জোছনা ঝরে ঝরে পড়ছে। অলৌকিক মন্ত্রমুগ্ধতায় সেই চাঁদ আর জোছনা ঝরা দেখতে দেখতে কত সময় কেটে গিয়েছিল তা মনে নেই। শুধু মনে আছে ভালো লাগার কথা। কীযে ভালো লাগা। এরকম অসাধারণ ভালো লাগার সময় জীবনে হয়তো খুব বেশি আসেনা।

বর্তমানে ব্যস্ত রাজধানীর বুকে বাস করছি তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে। এখন এই শহরে চাঁদ, জোছনা, পূর্ণিমা এসব বিরল ব্যাপার। আকাশচুম্বি সব অট্টালিকার ওপার থেকে কখন যে চাঁদ ওঠে আর কখন যে অস্ত যায় তা টেরই পাইনা। তাই মনোমুগ্ধকর জোছনা আর চোখে পড়ে না। দিনে দিনে জোছনা দেখার চোখটাই হয়তো হারিয়ে ফেলছি। কর্মব্যস্ততার কঠিন কষাঘাতে চাঁদের দিকে তাকাতেই যেন ভুলে গেছি। তবে আজও যখন গ্রামে যাই, যখন গভীর রাতে বিদ্যুৎহীন বাড়ির উঠোনে হাঁটি তখন গাছের ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র সুন্দর জোছনাকে গলতে দেখি আর দূরের নক্ষত্রেরা মহাবিশ্বের বিপুল বিস্ময় নিয়ে আমাকে মোহাবিষ্ট করে রাখে যেন আমি এই পৃথিবীতে নেই। ভিন্নলোকে চলে গেছি। জোছনা আমাকে প্রকৃতির গভীর রহস্যের ভেতর নিয়ে যায়। কিন্তু শুধুই গ্রামে নয়, আমি আমার এই প্রিয় শহরেও অনেক অনেক জোছনা চাই। এই শহরের ধুলোর মেঘ সরিয়ে, বিজলি বাতিকে ম্লান করে জানালার ফাঁক গলে সেই জোছনা আমাদের সবার ঘরে আসবেই। সমস্ত কালো আর মন্দকে সরিয়ে রেখে আনবে শুভ্রতা। আলোয় আলোয় ভরিয়ে দেবে মানুষের চোখকে, মনকে।

■ *লেখক পরিচিতি : জেডি, ডিবিআই-৩, প্র.কা.*

অ্যানি ফিঞ্চের কবিতা

প্রত্যুষে প্রেম

অনুবাদ : মোঃ নাসিরুজ্জামান

[কবি অ্যানি ফিঞ্চের জন্ম ৩১ অক্টোবর ১৯৫৬ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। বর্তমানে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে তিনি বেশ সুপরিচিত। সাহিত্যবোদ্ধারা তাঁর লেখাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচনায় রাখছেন। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনকারী অ্যানি সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। দুই সন্তানের জননী অ্যানি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তাঁর উদ্ভাবনীমূলক লেখা 'দ্য এনসাইক্লোপেডিয়া অব স্কটল্যান্ড' ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় এবং তা ব্যাপক প্রশংসিত হয়।]

প্রত্যুষের একটি নতুন পাখি,
আমাকে জাগিয়ে তোলে
একটি শান্ত নীড়ের বাইরে
যে ধাবিত হয় উড্ডয়নের পথে,
দ্রুত পরিবর্তনশীল
ধীর নতজানু
শ্বাসপূর্ণ শরীর,
জীবন-জোত, প্রতীক্ষা
স্বচ্ছ জলের মতো পরিষ্কার,
উত্তপ্ত-প্রবাহ, অগ্নি-তাড়িত
সহানুভূতিশীল সহচর,
রহস্য এবং পর্বত,
অন্ধকার তলদেশ,
পৃথিবী নোঙ্গরবদ্ধ।

কবি পরিচিতি: এমডি (চলতি দায়িত্বে), এসপিসিবিএল

অদম্য মহাপুরুষ

মোঃ হাবিবুর রহমান

পাহাড়ের ওপারে ডিঙি নৌকা
এ পাশে কবিদের লেফট রাইট।
ভীষণ ব্যস্ত নদী।
ছাপোষা, কেউ জানেনা সাঁতার
অগত্যা খরগোশেরাই আজ, অদম্য মহাপুরুষ !
আমাদের ছোট গাঙে ছিল না ইলিশ
কোনোকালে। তবু পালতোলা নায়ে
কিছু হেঁয়ালি বাতাস-
আমাদের করে দিত কবি।
এই তল্লাটে তখন ফুল আর পাখিরাই
জাগত রাত। শিশির ছিল রৌদ্রমিথুন।
ঐ তো ওখানেই নেমেছিল জোড়া বুনোহাঁস
তাদের যুগ্মশ্বাস ! সে কি আলোড়ন !
এতটুকু নদী তার ছোট পাড় কি মনোহর !
আহা ! এই তল্লাটে সেই একটি দিন-
একটি দিন ছিল বটে !
কীভাবে যে কেউ কেউ পেয়ে যায় পালকের খোঁজ !
কবিরাও বনে যায় লেঠেল সেপাই !
লেফট-রাইট, লেফট-রাইট, অবিরাম পাষণ্ড, বর্বর।
ও দিকে শেয়ালেরা গোছায় আখের।
ব্যস্ত নদীর দু'ধারে অগোছালো বালুর মতন
ছাপোষারা জমেই শুধু-
অগত্যা খরগোশেরাই হয়ে উঠে
অদম্য মহাপুরুষ !

কবি পরিচিতি: ডিডি, খুলনা অফিস

দুঃসময়ের গান

অচিন্ত্য দাস

অফিস ঘরের সেই ব্যস্ততা আর নেই
সপ্তাহ মাস জুড়ে ছুটির হাওয়া
ইস্তফা স্বেচ্ছায় আধাবেলা শয্যায়
রুটিনের বাকিটুকু শুধু নাওয়া খাওয়া
দিন কাটছিল বেশ অফিসের দায় শেষ, কিন্তু নতুন দায় পরিচয় ঘিরে
বলতে গেলেই দ্বিধা কই যেন পড়ে বাধা, বিড়ম্বনা ঘনিয়ে আসে ধীরে ধীরে
তড়িঘড়ি আপাতত যা হোক এবারের মতো
যেমন তেমন হোক সমাধান চাই
আনাচকানাচ জুড়ে ভরসার খোঁজ পড়ে
একটু হলেই হবে তারও দেখা নাই
ভরসার অবশেষ পাওয়া গেল শেষমেষ
ভিজিটিং কার্ডের বাক্সটাতে, পরিচয় চিরকুট তা সে হ'লই বা ঝুট
তাই সই আপাতত মুখ বাঁচাতে
সামাজিকতার দায় কোনোমতে ঘুচে যায়
আধো আধো ভাববাচ্যের উছিলায়
কার্ডের ভরসায় পরিচয় ফিরে যায়
বিগত অধ্যায়ের সাবেক চেহারায়
ভরসার বাক্স গুণে গেঁথে একশ'
কমে আসে হররোজ ধারাপাত মেনে
ফুরোবার আগে তাই কয়েকটা থাকা চাই
রাখা চাই যেভাবেই হোক টেনেটুনে
কবিতার বইগুলো সব্বাই এলোমেলো, পড়ে থাকে সিঁড়ির তলায় গুটিসুটি
ক্ষয়ে আসা পরিচয় দুরন্ত অসময়, চলে শুধু ভগ্নাংশের কাটাকাটি
কাটাকুটি শেষমেষ পরিচয় ভাগশেষ
ভিজিটিং কার্ড ক'টা থাকে পকেটে
কার্ডগুলো ফুরোলেই নটে গাছ মুড়োবেই, অস্বস্তির পরিচয় সংকটে।

কবি পরিচিতি: এডি, ডিওএসএস, প্র.কা.

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

আগে জানো অর্থ

ভোলানাথ লেখে, 'আমি সর্বশীর্ষে,
ভাবখানা যেন এই জগতের বীর সে।
শীর্ষ মানেই হল সবচেয়ে উচ্চ
খামোখা সর্ব লিখে নাচিয়ো না পুচ্ছ !
শব্দ লেখার আগে জেনে নিয়ো অর্থ
শুদ্ধ লেখার সেটি বড় এক শর্ত

[আমরা অনেক সময় অর্থ পুরোপুরি না জেনে শব্দ ব্যবহার করি। 'শীর্ষ' তেমনি একটি শব্দ। 'শীর্ষ' শব্দের নানা অর্থ। এর অর্থ চূড়া, মস্তক, সর্বোচ্চ বা প্রধান স্থান। এর আরেকটি অর্থ মাথায় পরার 'টোপর' বা 'মুকুট'। এসব স্থলে 'শীর্ষ' বিশেষ্যপদ। বিশেষণপদ হিসেবেও শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। যেমন 'শীর্ষস্থান', 'শীর্ষস্থানীয়', 'শীর্ষ সম্মেলন' ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ : 'মেয়েটি এসএসসি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।' 'একটি শীর্ষস্থানীয় বাংলা দৈনিক খবরটি ছেপেছে।' 'সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে।' দেখা যাচ্ছে, 'শীর্ষ' মানেই হচ্ছে সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ, চূড়ায় অবস্থিত। আমরা বলি 'ধান্যশীর্ষ' বা 'ধানের শিষ'। এখানেও সেই একই ব্যাপার। ধানগাছের চূড়া বা সর্বোচ্চ অংশটাই হচ্ছে 'ধানের শিষ'। সর্বোচ্চ অর্থপ্রকাশক এই 'শীর্ষ'-এর আগে 'সর্ব' যোগ করবার কোন প্রয়োজন নেই, অবকাশও নেই। সুতরাং 'সর্বশীর্ষ' নয়, কেবলই 'শীর্ষ']

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরিতে নতুন সংগ্রহ

পাঠকদের জ্ঞানের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি উন্নয়ন, অর্থনীতি, সাম্প্রতিক ইস্যু ও সাহিত্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বই ও সাময়িকী সংগ্রহ করে। প্রকাশনাগুলো পাঠ করার মাধ্যমে পাঠকগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজেরা যেমন উপকৃত হন তেমনি সামষ্টিকভাবে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। নিম্নে পাঠকগণ এক নজরে সাম্প্রতিক সময়ে সংগৃহীত নিম্নোক্ত বই/সাময়িকী সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

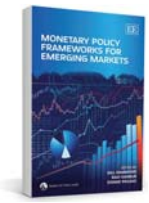

Monetary Policy Frameworks For Emerging Markets

- Raghuram G. Rajan and Luigi Zingales
Crown Business , USA; 2004

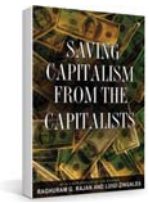

Saving Capitalism From The Capitalists : Unleashing The Power Of Financial Markets To Create Wealth And Spread Opportunity

- Raghuram G. Rajan and Luigi Zingales
Crown Business , USA; 2004

An Economist's Miscellany

- Kaushik Basu
Business Plus, USA; 2011
Oxford University Press, India; 2011

Growth with Equity: Contemporary Development Challenges Of Bangladesh

- Sadiq Ahmed
Bangladesh Institute Of Bank Management, Dhaka; 2015

Lords Of Finance : 1929, The Great Depression, And The Bankers Who Broke The World

- Liaquat Ahamed
Windmill Books, England; 2009

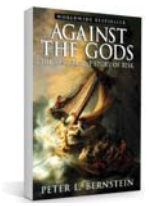

The Ascent of Money : A Financial History Of The World

- Naill Ferguson
Penguin Books, United Kingdom; 2009

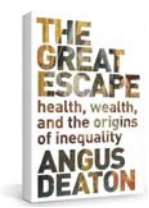

The Great Escape : Health, Wealth And The Origins Of Inequality

- Angus Deaton
Princeton University Press, USA ; 2015

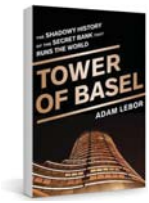

Tower Of Basel: The Shadowy History Of The Secret Bank That Runs The World

- Adam Lebor
Public Affairs, USA; 2013

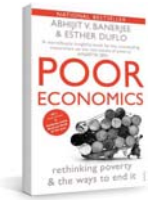

Poor Economics : rethinking poverty & the ways to end it

- Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo
Random House India, India; 2011

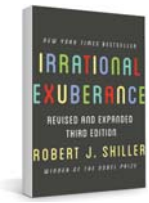

Irrational Exuberance : Revised And Expanded

- Robert J. Shiller
Princeton University Press, USA; 2015

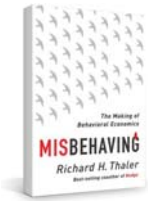

Misbehaving : The Making Of Behavioral Economics

- Richard H. Thaler
Penguin Books, USA; 2015

সিডনির পথে পথে

- বিরূপাক্ষ পাল
অন্য প্রকাশ, ঢাকা; ২০১৬

Report on Rural Credit Survey 2014 (Published in 2015)

- Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

Labour Force Survey Bangladesh 2013 (Published in 2015)

- Bangladesh Bureau of Statistics

Flow of External Resources into Bangladesh (As of 30 June 2015)

-Economic Relations Division
Ministry of Finance
Bangladesh

যে শহরে চলবে না গাড়ি!

পৃথিবীর সব বড় শহরই কমবেশি যানজট সমস্যায় ভুগছে। আর এই দুর্ভোগ কমাতেই কি না, যদি কোনো শহরে গাড়ি চালানো বেআইনি ঘোষণা করা হয়, তাহলে কেমন হবে? বিস্ময়কর এই পদক্ষেপ নিয়েছে নরওয়ের রাজধানী অসলোর হর্তাকর্তারা। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক সংবাদ ওয়েবসাইট নিউজ ডটকমে প্রকাশিত এক খবরে এমন জানা যায়। স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশটির রাজধানীতে নির্বাচিত হয়ে এসেছে বামপন্থী দল গ্রিন পার্টি। তাদের মুখপাত্র ল্যান মেরি বার্গ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য হলো ২০২০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনা। এ লক্ষ্য পূরণেরই প্রথম ধাপ হিসেবে আমরা অসলোতে গাড়ি চলাচল বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছি।' ২০১৯ সাল নাগাদ এই ঘোষণা কার্যকর হবে বলে জানা যায়। এরই মধ্যে শহরে অন্তত ৬০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করা হবে সাইকেল চালকদের জন্য। এ ছাড়া ব্যক্তিগত গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ হলেও পাবলিক বাস বা ট্রামের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। ফলে নাগরিকদের যাতায়াতে কোনো সমস্যা হবে না বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। এ ছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে। আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হলেও এই নতুন ঘোষণা বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। গত বছর চালিত এক জরিপে দেখা যায়, ২৫ শতাংশ নরওয়েজীয় সাইকেল চালিয়ে অথবা হেঁটে কর্মক্ষেত্রে যান। 'ট্রান্সপোর্টেশন অলটারনেটিভ'-এর প্রধান পল হোয়াইট বলেন, 'একটি গাড়ি পার্ক করতে যে পরিমাণ স্থান লাগে, সেখানে ১৫টি সাইকেল পার্ক করা যায়। নিঃসন্দেহে শহরে গাড়ি নিষিদ্ধ করা একটি ভালো উদ্যোগ।' পরিবেশবান্ধব নীতির জন্য বরাবরই

সাইকেলের নগরী নরওয়ে

নরওয়ে প্রশংসিত হয়ে এসেছে। রাজধানীতে ব্যক্তিগত গাড়ি নিষিদ্ধ করার এ ঘোষণা সেক্ষেত্রে আরো প্রশংসা কুড়িয়ে আনবে উত্তর ইউরোপের দেশটির জন্য।

হাঁসের জন্য রাস্তা!

যেসব রাস্তায় গাড়ি চলে, আমরা তার পাশের হাঁটার রাস্তায় বা ফুটপাথে হেঁটে চলাচল করি। ফুটপাথ দিয়েই হেঁটে চলা স্বাভাবিক এবং নিরাপদ। কারণ, গাড়ির রাস্তায় হাঁটলে যেমন জ্যাম হবে, তেমনি ঘটবে দুর্ঘটনা। এ তো গেলো স্বাভাবিক ঘটনা, এখন শোনা যাক এক বিস্ময়কর খবর। ডেইলি মেইলের এক খবরে জানা গিয়েছে ইংল্যান্ডের বেশ কিছু রাস্তায় হাঁসের জন্য আলাদা ভাবে

হাঁসেরা নিজেদের ছবি দেখে হেঁটে যাচ্ছে

নির্দিষ্ট পথ করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে কেবল চলবে হাঁস! এর অবশ্য সুন্দর কারণও আছে। ইংল্যান্ডের অনেক সড়কের পাশেই দেখা মেলে লেকের, যেখানে ডুবসাঁতারে মেতে থাকে হাঁসের দল। মাঝেমধ্যেই এরা লেক থেকে রাস্তায় উঠে আসে, সমস্যায় পড়ে যানবাহন চালক, সাইকেল চালকসহ পথচারীরা। কখনো কখনো আবার দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয় অবুঝ হাঁসদের। তাই তাদের নিরাপত্তা এবং পথচারীদের সমস্যার সমাধান করতেই প্রশাসন গ্রহণ করেছে এই অভিনব ব্যবস্থা। পশু-পাখিদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও সচেতনতা তৈরিও এ ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই বিচিত্র উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে দেশটির ক্যানাল অ্যান্ড রিভার ট্রাস্ট বিভাগ। এ পদ্ধতি চালু করায় হাঁসেরা রাস্তায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে নিজের মতো করে দলবেঁধে চলাফেরা করতে পারছে। তবে তারা তো আর মানুষের মতো বুদ্ধিমান নয় যে, সহজেই নিজের রাস্তা চিনে নেবে। তাই তাদের রাস্তা চেনানোর জন্যও গ্রহণ করা হয়েছে অভিনব পন্থা। তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া রাস্তায় হাঁসের ছবি এঁকে দেওয়া হয়েছে। এতে হাঁসগুলো চিহ্ন দেখে নিজেদের পথ চিনে নিতে পারছে এবং ঘুরছে।

জন্মদিনে পাহাড় উপহার!

জন্মদিনের উপহার হিসেবে কতকিছুই না দেওয়া হয়, কিন্তু তাই বলে আস্ত একটা পাহাড়! তাও আবার একটা গোটা দেশকে যদি এই উপহার দেওয়া হয়, তাহলে তো অবাক হওয়ার মতো খবরই বটে। কিন্তু এই ঘটনাই ঘটতে চলেছে উত্তর ইউরোপের দুটি দেশের মধ্যে। বিজ্ঞান বিষয়ক ওয়েবসাইট মেন্টাল ফ্লস ডটকম জানিয়েছে এই খবর। গেইর হারসন নামের এক নরওয়েজিয়ান এই অদ্ভুত পরিকল্পনার হোতা। সম্প্রতি তিনি ফেসবুকে এক প্রচার শুরু করেছেন যাতে তাঁদের সরকার প্রতিবেশী দেশ ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই পাহাড় উপহার দেয়। দেশ দুটির মধ্যে প্রায় ৭৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। হারসনের উদ্দেশ্য সফল হলে নরওয়ে-ফিনল্যান্ডের সীমান্ত ৪৯০ ফিট উত্তরে এবং ৬৫০ ফিট পূর্বে সরে যাবে। এর ফলে হালতি পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ফিনল্যান্ডের সীমানার ভেতরে পড়বে। ৪৪৭৯ ফুট এই শৃঙ্গটিই হবে ফিনল্যান্ডের সবচেয়ে উঁচু স্থান। ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হারসন বলেন, 'বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন এতে আসবে না, নরওয়ের আকার মাত্র ০.০১৫ বর্গকিলোমিটার কমবে এই পর্বত হস্তান্তরের মাধ্যমে। নরওয়ের ব্যাপারে ফিনল্যান্ডের নাগরিকরা খুবই উঁচু ধারণা পোষণ করে থাকেন, কাজেই এ রকম একটি উপহার তাঁদের দেওয়াই যায়।' নরওয়ের ম্যাপিং কর্তৃপক্ষের প্রধান ক্যাথারিন ফ্রস্টাপ কিন্তু এই প্রস্তাব ভালোভাবেই নিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, 'ফিনল্যান্ড আমাদের বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশটিতে কোনো

উপহার হিসেবে পাহাড় কম অভিনব নয়

পর্বতশৃঙ্গ নেই, সে ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমী উপহার দুই দেশের সম্পর্কে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তবে আগে দুই দেশের সরকারকে একমত হতে হবে।' এসব জল্পনা-কল্পনা করার জন্য অবশ্য এখনো বেশ কিছুটা সময় হাতে আছে। ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতার ১০০তম বর্ষপূর্তি হবে ২০১৭ সালে।

■ *গ্রন্থনা: মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

ইউরো বিষয়ে ইসিবির নতুন ঘোষণা

৫০০ ইউরো মূল্যমানের নতুন কাগুজে নোট ছাপানো বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক (ইসিবি)। তবে ছাপানো বন্ধ হলেও নোটটি সচল মুদ্রা হিসেবে পরিগণিত হবে ও এর মূল্যমান অপরিবর্তিত থাকবে। এছাড়া ইসিবির বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে নোটটির লেনদেন অব্যাহত থাকবে। সম্প্রতি পরিচালনা পরিষদের এক বৈঠক শেষে ইসিবি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইসিবি জানিয়েছে, ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করা হবে। এ সময় ব্যাংকটি ১০০ ইউরো ও ২০০ ইউরোর নতুন নোট বাজারে ছাড়বে। বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে সর্বোচ্চ মূল্যমানের ব্যাংক নোটটি ছাপানো বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসিবি। মূলত সন্ত্রাসীরাই ৫০০ ইউরোর নোট বেশি ব্যবহার করে, এ মর্মে ২০১০ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এর পর ইউরোপীয় ব্যাংকগুলোকে নোটটির মাধ্যমে লেনদেন না করার জন্য আহ্বান জানায় যুক্তরাজ্য।

ইসিবি ৫০০ ইউরো মূল্যমানের কাগুজে নোট ছাপানো বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে

জাপানের মুদ্রাভিত্তি রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি

চলতি বছরের এপ্রিলে জাপানের মুদ্রাভিত্তি (সঞ্চালিত ও সঞ্চিত মুদ্রার ভারসাম্য) টানা পঞ্চম মাসের মতো বেড়েছে। ব্যাংক অব জাপানের (বিওজে) গৃহীত শৈথিল্য ব্যবস্থায় বাজারে আরো তারল্য সরবরাহের কারণে দেশটির মুদ্রাভিত্তি বাড়ল। বিওজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এপ্রিলে জাপানের মুদ্রাভিত্তি বেড়ে বছরওয়ারি ২৬ দশমিক ৩ শতাংশ হয়েছে।

জাপানের মুদ্রাভিত্তি রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, গত মাসের শেষে জাপানের মুদ্রাভিত্তি বেড়ে রেকর্ড ৩ কোটি ৮৬ লাখ ১৯ হাজার কোটি ইয়েনে (৩ লাখ ৫৯ হাজার কোটি ডলার) দাঁড়িয়েছে। জাপানের দশকব্যাপী মূল্যসংকোচনের চাপ সামাল দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত আগ্রাসী পরিমাণগত শৈথিল্য কর্মসূচি বৃদ্ধির পেছনে প্রভাব রেখেছে। এর পাশাপাশি সুদের হার ঋণাত্মক দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রভাবও রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ নজিরবিহীন পদক্ষেপ জাপানের বাজারে অর্থ ফিরিয়ে নিতে ভূমিকা পালন করেছে। এদিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাভিত্তি বৃদ্ধি করে বার্ষিক ৮০ লাখ কোটি ইয়েনে উন্নীত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। বিওজে জানিয়েছে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির চলতি হিসাবের আমানত ভারসাম্য ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়ে ২ কোটি ৮৪ লাখ ৪১ হাজার কোটি ইয়েনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া সঞ্চালিত ব্যাংকনোট বছরওয়ারি বেড়েছে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ ও ধাতব মুদ্রা বেড়েছে দশমিক ৯ শতাংশ।

সৌদি আরবের অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন

অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে সরকারের উচ্চপর্যায়ে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে সৌদি আরব। এরই অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় পুনর্গঠন করা হয়েছে। জ্বালানি মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শীর্ষপদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ এক রাজকীয় ফরমানে এ রদবদল ঘোষণা করেন। এর আগে গত মাসে দেশীয় অর্থনীতিকে জ্বালানিনির্ভরতার বৃত্ত থেকে বের করতে ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়াতে সৌদি সরকার এক পরিকল্পনা প্রকাশ করে। সৌদি আরবের ডেপুটি যুবরাজ এবং অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন-বিষয়ক পর্ষদের প্রধান মোহাম্মদ বিন সালমান এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সৌদি ভিশন ২০৩০ শীর্ষক এ পরিকল্পনায় তেলের পরিবর্তে বিনিয়োগকে সৌদি অর্থনীতির চালিকাশক্তিতে রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদশালী দেশটি এজন্য বিশ্বের বৃহত্তম সার্বভৌম বিনিয়োগ তহবিল গঠনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জ্বালানি তেলের মূল্যপতনের কারণে দুই বছর ধরে সৌদি আরবের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য রকম হ্রাস পেয়েছে। মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও আমদানি ব্যয় সামলাতে দেশটির বৈদেশিক রিজার্ভ যথেষ্ট কমেছে। গত বছর সৌদি আরব রেকর্ড ৯ হাজার ৮০০ কোটি ডলার বাজেট ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৌদি সরকার বেশকিছু খাতে প্রদত্ত ভর্তুকি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। তেল শিল্পকে কেন্দ্র করে সৌদি অর্থনীতির চাকা ঘুরে থাকে। গত বছর দেশটির রাজস্ব আয়ের ৭০ শতাংশের বেশি এসেছে তেল খাত থেকে। অর্থনীতিকে টেনে তুলতে সৌদি নীতিনির্ধারকরা সাম্প্রতিক সময়ে জ্বালানিনির্ভরতা থেকে সরে আসতে উদ্যোগী হয়েছেন। গত বছর জানুয়ারিতে বাদশাহ সালমানের ক্ষমতারোহণের পর থেকে সৌদি জনপ্রশাসন ও অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

সৌদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শীর্ষপদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। গভর্নর ফাহাদ আল-মুবারককে সরিয়ে তার স্থলে আহমেদ আল-খালাইফিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আল-খালাইফির আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর (গবেষণা ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি) পদে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া সৌদি আরবের পরিবহন, হজ্ব ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়েও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এসব মন্ত্রণালয়ে নতুন নেতৃত্ব নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় পর্যটন ও ভ্রমণ থেকে আয় বাড়াতে হজ্ব মন্ত্রণালয়ের নাম পাল্টে হজ্ব ও উমরাহ্ মন্ত্রণালয় রাখা হয়েছে। গত বছর ৮০ লাখ মানুষ উমরাহ্ করতে গেছেন। সৌদি সরকার ২০২০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দেড় কোটিতে উন্নীত করতে চায়।

বাদশাহ্‌র নেতৃত্বে সৌদি অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে

মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে বাদশাহ সালমান পানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় বিলুপ্ত ঘোষণা করেছেন। বিদ্যুৎ বিভাগ জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অঙ্গীভূত হবে। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবে কৃষি মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের নাম পাল্টে পরিবেশ, পানি ও কৃষি মন্ত্রণালয় রাখা হয়েছে। সৌদি সরকার সংস্কৃতি ও বিনোদন-বিষয়ক দুটি নতুন কমিশন গঠন করেছে। উল্লেখ্য, সৌদি আরবে এখনো কোনো মুভি থিয়েটার অনুমোদন করা হয়নি।

■ *গ্রন্থনা: মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

মোঃ ইসমাইল হোসেন

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২১/১/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ১/৭/২০১৬
বিভাগ : এইচআরডি-১

গোপাল চন্দ্র দাস

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২২/২/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি : ১১/১২/২০১৫
বিভাগ : সচিব বিভাগ

তুলসী দাস রায়

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৫/১/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি : ১৭/৪/২০১৬
খুলনা অফিস

মোঃ আব্দুর রশীদ

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৬/১১/১৯৮৪
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৬
বিভাগ : এইচআরডি-১

আমিনুল হক খান

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৬/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ১৮/১/২০১৬
মতিঝিল অফিস

শেখ সিরাজুল মনির

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৩০/৮/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১৩/৫/২০১৬
খুলনা অফিস

দেওয়ান তওহিদুল ইসলাম

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৭/৩/১৯৮৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১/৩/২০১৬
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোঃ এনামুল হক

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৪/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ১১/৯/২০১৫
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোঃ শাহ আলম-১

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৬/২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ২০/৯/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ আব্দুস ছাত্তার

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৪/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১২/১২/২০১৫
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোহাম্মদ মহসীন আলী

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৬/৯/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৮/৪/২০১৬
বিভাগ : এফআরটিএমডি

মোঃ সাইদুর রহমান -১

(কেয়ারটেকার-২য় মান)
ব্যাংকে যোগদান : ১৮/৫/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১২/৫/২০১৬
খুলনা অফিস

মোঃ আব্দুর রউফ

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৬/১২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১১/৫/২০১৬
বিভাগ : এমপিডি

ওম্মে হাবীবা

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৫/৮/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১৪/১/২০১৬
বিভাগ : সচিব বিভাগ

মাহবুবল হক

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৮/৮/১৯৮৪
অবসর উত্তর ছুটি : ১০/৪/২০১৬
বিভাগ : এইচআরডি-২

উম্মে রাইহা

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৪/৩/২০১৬
মতিঝিল অফিস

শোক সংবাদ

মোঃ চাঁদ আলী

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
জন্ম : ১/১/১৯৬১
ব্যাংকে যোগদান : ২০/৭/১৯৮৩
মৃত্যু : ৬/৫/২০১৬
বগুড়া অফিস

মোঃ কাজী আব্দুস সামাদ

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
জন্ম : ৩/৫/১৯৫৮
ব্যাংকে যোগদান : ১৭/৬/১৯৮০
মৃত্যু : ২৬/৪/২০১৬
মতিঝিল অফিস

২০১৬ সালে এসএসসি জিপিএ-৫

অভিশ্রুতি মোদক
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: প্রীতি রানী মোদক
পিতা: উত্তম কুমার মোদক
(জেডি,এফইআইডি, প্র.কা.)

খায়রুন্নেসা লিমা
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ফাতেমা খাতুন
পিতা : মোঃ খলিলুর রহমান
(সিনি. সিটি, গভর্নর সচিবালয়, প্র.কা.)

এহ্‌তেশামুল বিভান
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ হালিমা বেগম লিপি
পিতা : মোঃ আতোয়ার হোসেন প্রধান
(জেডি, সিএসডি-১, প্র.কা.)

মোঃ তানভীর হোসেন
এ. কে. স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সেলিনা আক্তার
পিতা : মোঃ আলাউদ্দিন
(মুদ্রা/নোট পরিক্ষক, মতিঝিল অফিস)

সুমাইয়া কবীর
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সামসুন নাহার
পিতা: এইচ. এম. হুমায়ুন কবীর
(জেডি, ডিবিআই-৩, প্র.কা.)

মোঃ রাফিউল আলম (রাফি)
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রাবেয়া বাসরী
(ডিডি, ইএমডি, প্র.কা.)
পিতা: খায়রুল আলম
(ডিডি, ইডি-১ শাখা, প্র.কা.)

মোঃ আমিনুল ইসলাম
খুলনা জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হোসনে আরা খানম
পিতা: মোঃ মহিবুল্লাহ
(ডিএম অবসর, খুলনা অফিস)

সৌমিক ইসলাম শাকিল
খুলনা জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নার্গিস রশীদ
পিতা : গাজী হারুন অর রশীদ
(এএম, খুলনা অফিস)

ফাহিম আহমদ খান
শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: লুৎফুন্নাহার
পিতা: রকীব আহমেদ খান
(জেডি, ডিওএস, প্র.কা.)

মোঃ তামিম শাহরিয়ার (তূর্য)
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাছিমা খাতুন
(ডিডি, কৃষি ঋণ বিভাগ, প্র.কা.)
পিতা: মোল্লা মতিয়ার রহমান

মোঃ শাকিল
মতিঝিল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শিউলী আক্তার
পিতা: মোঃ আবু শহীদ
(ডিএম, সদরঘাট অফিস)

তানজিল জাহান শৈলী
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: রোকেয়া আক্তার
পিতা: মোঃ ওছমান গনি
(জেডি, গভর্নর সচিবালয়, প্র.কা.)

ফারহান ফিদা
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ফাহমিদা ইয়াসমিন
পিতা : মোঃ আমির হোসেন
(ডিডি, বিআরপিডি, প্র.কা.)

২০১৫ সালে পিএসসি জিপিএ-৫

সায়রা জান্নাত মৌনতা
মহাম্মাদনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি)

মাতা: ফাওজিয়া আক্তার
পিতা: হুমায়ূন কবির মোঃ মনিরুজ্জামান
(ডিএম, খুলনা অফিস)

মায়িশা মনোওয়ারা
খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল (ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি)

মাতা: হোসনে আরা খানম
পিতা: মোঃ মহিবুল্লাহ
(ডিএম অবসর, খুলনা অফিস)

প্রিয়তি বিশ্বাস
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: অনিতা বিশ্বাস
পিতা: বিষ্ণু পদ বিশ্বাস
(ডিজিএম, গবেষণা বিভাগ, প্র.কা.)

মোঃ মুকতাদিরুল হক
মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর

মাতা: সামছুন নাহার আক্তার
পিতা: আ.খ.ম. জহুরুল হক
(ডিএম, সিলেট অফিস)

ইফ্‌ফাত জাহিন
ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইন্সটিটিউট (ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি)

মাতা: আজিজা সুলতানা
পিতা: মোঃ হাবিবুর রহমান
(জেডি, সিইইউ, প্র.কা.)

বর্ণাঢ্য আয়োজনে ক্রিকেট

চার-ছক্কার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ! তাও আবার দেশের অর্থ আর মুদ্রানীতির প্রাণকেন্দ্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ! ক্রিকেট বিশ্বায়নের এ যুগে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তারাও পিছিয়ে নেই। চার-ছক্কা আর আউট-আউট হৈ-হুল্লোরে মাততে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকা আয়োজন করে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২০১৬। সাড়া জাগানো এ প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ২০ মে ২০১৬। বহুল আকাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত ফাইনাল ম্যাচটি দর্শকসারিতে বসে গভর্নর ফজলে কবির উপভোগ করেন এবং ম্যাচশেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিবিটিএ'র প্রিন্সিপাল কে. এম জামশেদুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক আবু ফরাহ মোঃ নাছের, মোঃ খুরশীদ আলম, মোঃ জামান মোল্লা, মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ আহমেদ আলী, মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান সর্দার, প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ব্যাংক ক্লাবের সাবেক সভাপতি নওশাদ মোস্তাফা এবং সভাপতিত্ব করেন সভাপতি আবু হেনা হুমায়ুন কবির লনী।

চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ ট্রফি বিতরণের আগে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ফজলে কবির ক্রিকেট নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেন। এই টুর্নামেন্টের সফল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তিনি। এসময় বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রিকেটদলকে জাতীয় পর্যায়ে খেলার সক্ষমতা অর্জনে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

১৫ দিনব্যাপী এ ক্রিকেট প্রতিযোগিতাশেষে আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনাল খেলে। সেখান থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ হয় চারটি দল। এই চারটি দল হ'ল- ডিবিআই-১ ও ২, বিবিটিএ, ডিএমডি এবং ইএমডি-১। ফাইনালে মুখোমুখি হয় ডিএমডি ও বিবিটিএ। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দু'দলের মধ্যে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতাপূর্ণ ফাইনাল খেলায় ডিএমডি, বিবিটিএকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এতে ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট হন চ্যাম্পিয়ন দলের মোঃ এনামুল হক ও ফেয়ার-প্লে ট্রফি অর্জন করে এফআইডি দল। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ব্যাংক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আরিফুল ইসলাম আরিফ। ক্লাব সভাপতির ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সফল এই টুর্নামেন্টের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এর আগে, ৫ মে ২০১৬ তারিখে পর্দা উঠে ব্যাপক জনপ্রিয় ও সাড়া জাগানো এ ক্রিকেটযজ্ঞের। ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জমকালো এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী ম্যাচে বিগত চ্যাম্পিয়ন টিম ডিএমডি ও রানার্সআপ টিম ডিবিআই-৪ অংশগ্রহণ করে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ আহমেদ আলী, মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান সর্দার, প্রভাষ চন্দ্র মল্লিকসহ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সিবিএ, ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, ব্যাংক ক্লাবের সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ব্যাংক ক্লাবের সাবেক সভাপতি নওশাদ মোস্তাফা ও সাহিত্য সম্পাদক হামিদুল আলম সখা, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আবু হেনা হুমায়ুন কবির লনী এবং উদ্বোধনী মোঃ আরিফুল ইসলাম আরিফ।

প্রায় ৪০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণে এবারের আন্তঃঅফিস ক্রিকেট আয়োজন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ব্যাংক ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ প্রকৃত ক্রিকেটীয় আদলে পরবর্তী প্রতিযোগিতা আয়োজন করার যাবতীয় কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতে জাতীয় পরিসরে পৌঁছে যাবে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রিকেট; তেমনি আয়োজনের প্রত্যাশায় রয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তারা।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৬৫, আরামবাগ, ঢাকা।